বিকেলের ময়দান

কালিপদ চক্রবর্তী

বর্ণমালা প্রকাশনী
২৫, হরিগঙ্গা বসাক রোড।
আগরতলা, ত্রিপুরা।

BIKELER MAIDAN
Collection of srhort stories
by kalipada Chakraborty

প্রথম প্রকাশ
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

প্রকাশিকা
শ্রীমতী ফুলন ভট্টাচার্য্য
বর্ণমালা প্রকাশনী

প্রচ্ছদ: সমীর চক্রবর্ত্তী

মুদ্রণ :
বর্ণমালা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং
কো: অপ: সোসাইটি লি:
২৫, হরিগঙ্গা বসাক রোড্

মূল্য আট ৮ টাকা

যে বোধে কালিপদ মিছিলে যান, যে চেতনায় তিনি প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে সচেষ্ট; যে বিশ্বাসে সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী, যে শ্রদ্ধায় ছাত্রকে কিছু দিতে চান—ঠিক একই বোধ, চেতনা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধে ও নিষ্ঠায় তিনি লেখেন। কালিপদ লেখেন কম, নিতান্তই কম,— তাই তাঁর লিখিত গল্পের সংকলন প্রকাশ একটা কঠিনতর কাজ। এ সংকলনে এক দশক বা তারও আগে লেখা গল্পও আছে— কিন্তু সেটাই কালিপদর চিন্তা ভাবনা ও লেখার রূপায়সের প্রকৃষ্ট প্রমান নয়।

মগ্ন মৈনাকের মত—যতটা কালিপদ প্রকাশিত তার চেয়ে অনেক বেশী সর্বদাই নিজেকে প্রস্তুত রাখেন—অগোচরে। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁকে আলোড়িত করে কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না— এটা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা যায়।

এ রাজ্যে, অনেকেই লেখেন বা লেখালেখির চেষ্টা করেন। এবং বেশ সন্তৃপ্ত মনোভাবে বিবশ হয়ে থাকেন যে বৃক্ষহীন ক্ষেত্রে এরাই বৃক্ষ। কালিপদ চক্রবর্তী—সেই অবস্থার একজন ব্যতিক্রম—একান্তই ব্যতিক্রম।

শিল্প সাহিত্য জগতেও—অনেকের চেয়ে প্রকৃষ্ট ক্ষমতাবান কালিপদ—চাপল্য বা বাচালতার মোহময় অঙ্গন থেকে দূরে থেকে প্রকৃতই লেখার চেষ্টা করেন। এবং এই চেষ্টা তাঁর নিয়ত জীবন যাত্রার সঙ্গী।

কালিপদ চক্রবর্তীর পূর্ণাঙ্গ গল্প সংকলন প্রকাশ করতে হবে—কালিপদর জন্য নয় ত্রিপুরার সাহিত্য চেষ্টার প্রামাণ্য দলিলের জন্য। এবং কালিপদকে লিখতে হবে—কোন অজুহাত শোনার কারণ নেই।

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

তীর
ঢল ১৫
শিয়াল ২১
রোশনাই ৩০
মেজাজ বিষয়ক ব্যক্তিগত ৩৭
সাধ ৪২
একটি বন্ধুত্বের ইতিহাস ৪৯
বিকেলের ময়দান ৫৩

তীর

দৃশ্যটা বাস্তবিকই অদ্ভুত ছিল। তার বাম হাত উপরের দিকটা মুঠো করে ধরে থাকলেও নীচের দিকে তীরের ফলাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ডান হাতের বাহুমূলের কাছ দিয়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে তীরটা। এখন আর টাটকা রক্ত বেরোচ্ছিল না, তবে হাতের অনেকটা অংশই জমাটবাঁধা কালো রক্তে রঞ্জিত। তার উর্দ্ধাঙ্গ পুরোপুরি নগ্ন, কোমরে একফালি ন্যাকড়া মাত্র বেড় দেয়া, পা দুটি হাঁটু পর্যন্ত ধুলার আস্তরনে ঢাকা, কপালে নাকের ডগায় বড় বড় ঘামের ফোঁটা, দু'গালের কাঁচা পাকা দাড়ির ভেতর দিয়ে ঘামের ধারা নামছে, সমস্ত শরীর ঘামে, ধুলায় চিটচিটে। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে শহরের প্রবেশপথে দাঁড়ানো তার সামগ্রিক এই চেহারাটা নূতন রকম ঠেকলেও যে কয়জন তার আশপাশে থমকে দাড়িয়েছিল, অদ্ভুত কিছু তারা ভাবে নি। এ'ত জানা কথাই, হয়ত মারামারি লেগেছিল, তীর এসে হাতটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিতে শহরের হাসপাতালে চলে এসেছে থ'লিয়ে নিতে। তারা হাসপাতালের পথ দেখিয়ে দিয়ে বলেওছিল, ইহান দিয়্যা যাও। কিন্তু ষষ্ঠীচরণের কথায় সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন তোলগোল পাকিয়ে যায়। প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও, বেশ দৃঢ়চিত্তেই চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সে সংক্ষেপে বলে, আমি হাকিমের কাছত যামু। এবং এরপরই তার চারপাশে আস্তে আস্তে ভীড় জমতে থাকে, দুপুর রোদের মধ্যেও চালাক চতুর, বোকাহাবা, ধূর্ত বেশ কয়টা মুখ কোথা থেকে এসে উদয় হয়। হাতে তীর মেরেছে কেউ, কিন্তু তাই বলে তীরটা বের না করে এমনভাবে একেবারে হাকিমের সামনে গিয়ে পৌঁছানোর বাসনা! ব্যাপারটা অভিনব বটে। তবে কিনা, ষষ্টির দেহটা বেশ বড়সড়, তীরটা ঢুকে আছে যেন কিছুই না। কেউ কেউ সপ্রশংস দৃষ্টিতে ষষ্টির দিকে চায়, অনেকের মুখে

বেদনার চিহ্ন, আহা!

কি অইছে কর্তা, হাকিমরে বুজি পরমান. দেহাইবা? দেহাইবা মানে? ষষ্ঠি প্রমাণ দেখাতেই তো বারটা মাইল ছুটে এসেছে তীরটা না খুলেই। একটানে এটা খুলে ফেলা তার কাছে কিছুই না, তার বিশাল শক্ত শরীরটার মত মনটাও শক্ত, কিন্তু তাহলে হয়ত হাকিম বিশ্বাস করবেন না, কেমন করে তীর মেরে তার ডান হাতটাকে অচল করে দেয়ার চেষ্টা করেছে ম্যানেজার এবং এভাবেই তার জমিটাকে, পুরো দু'বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী দিয়ে যেটাকে সে তৈরী করেছে তা কেড়ে নেবার ফন্দি চালাচ্ছে! ষষ্ঠি পারত, যে কয়টা এসেছিল, একাই তাদের মহড়া নিতে সে এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু একটাকে লাঠির ঘা মারতেই দূর থেকে তীর মারতে শুরু করল বুধনটা, ম্যানেজারের কুত্তাটা, আর ম্যানেজারটা ছিল পাশেই। ষষ্ঠী আর এগোয়নি ওরা মনে করেছে ষষ্ঠি পালাচ্ছে, কিন্তু ষষ্ঠী, তীরটা ঢুকে যাওয়া মাত্রই, লাঠি ফেলে দৌড়ে এসেছে। এমন একটা হাতে নাতে প্রমাণকে সে বৃথা যেতে দেবে না; ম্যানেজারের টাকা আছে, লোক আছে, একদলকে মেরে ফেললেও আরেক দল আনবে, ষষ্ঠী একা কতজনের বিরুদ্ধে লড়বে, তার চাইতে এই প্রমাণটি হাতে পেয়েছে, এবার সে পুলিশের কাছে যাবে, প্রমাণটা দেবে।

ষষ্ঠী চার মাইল দূরের থানায় গিয়ে উঠল। তখনও রক্ত গড়াচ্ছে ক্ষত দিয়ে। তীরটা সে বের করে নি, উপরের দিকটা মুঠো করে ধরে রেখেছে, যেন তা ফস্কে বেরিয়ে যাবে। আরও কয়েকবার সে থানায় এসেছে—অনেক ঘটনা, ম্যানেজারের অনেক কথা সাফ্ সাফ্ তুলে দিয়েও ষষ্ঠী দারোগাবাবুকে বিশ্বাস করাতে পারে নি। দারোগাবাবুর এক কথা—বাস্তব প্রমাণের অভাব, এমন কি কেউ তার হয়ে সাক্ষীও দেবেনা। শেষ পর্যন্ত একটি কথাই ষষ্ঠী বলেছে, কিন্তুক বেডা হয়তানের আড্ডি, ইডাত জানেন হুজুর। গর বারি পুরাইয়া দিব হুজুর, তার লেগ্যাইত কাউরে পাই না।

—তয় আমি কি করম্যু—দেশীয় টানেই দারোগাবাবু হেসেছেন, প্রমাণ না পাইয়া, সাক্ষী না জোগাড় কইরা বেডা মুখ্য, আমি কি নিজের চরণে কুড়াল মারুম?

এতদিনে প্রমাণ এনেছে ষষ্ঠী। বুধনের নিজের হাতে তৈরী তীর, এ

তীর বিশিষ্ট, আর বুধনটা যে ম্যানেজারের কুত্তা দারোগা বাবু নিশ্চয়ই জানেন।

সকাল বেলাই ষষ্ঠীকে এবেশে দেখে দারোগাবাবু হকচকিয়ে যান। ষষ্ঠী তো কোন মার দাঙ্গার মধ্যে নেই, দেহটা বিশাল হলে কি হয়, আসলে ষষ্ঠী অত্যন্ত নিরীহ। তার যত কিছু হম্বিতম্বি বিঘা কয়েক জমিটাকে ঘিরেই, এক ম্যানেজার আর তার দলবল বাদে এ তল্লাটে আর বোধহয় কেউ তার শত্রু নেই।

দারোগা বললেন, আরে! কি অইছেরে ষষ্ঠী? তীর মারছে কেডা? ষষ্ঠী বলল, হুজুর আপনে পরমান চাইছলেন, অই ছাহেন, বুদইন্যা আমারে তীর মারছে, মেনেজারবাবু লগেই আছ্‌লেন। হুজুর, আপনে মেনেজার বাবুরে দইর‍্যা আনেন।

সে বর্ণনা দেয়, কেমন করে, যখন সকালের মিষ্টি রোদে ধানের চারাগুলি হাওয়ায় দুলছিল, দুলে দুলে তাকে সোহাগ জানাচ্ছিল (একটা সুন্দর মুহূর্তের বর্ণনা দিতে এর চেয়ে বেশী কবিত্ব ষষ্ঠীর মত জন্ম চাষার কাছ থেকে আশা করা যায় না) তখন ম্যানেজারের দলবল তাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু ষষ্ঠী অত কাঁচা ছেলে নয়, লাঠিগাছটা সে সঙ্গে নিয়েই বেড়িয়েছিল, ম্যানেজারের মতলবতো তার আর বুঝতে বাকী ছিল না।

দারোগা বললেন, এই বেয়াইন্যা বেলাঅই কাইজ্যা লাগাইয়া বইলি? ষষ্ঠী দরজার সামনে বসে পড়েছিল, উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ইডা কেমুন কইলেন হুজুর, কাইজ্যা আমি লাগাইছি? আমার দান কাইট্যা নিতে আইব, আমি চাইয়া দেহুম? চাইয়া? ষষ্ঠীর চোখ উত্তেজনায়, রাগে জ্বলতে থাকে। হাতটা ফুলছে, টনটন করছে, ঘামে সমস্ত শরীর জ্যাবজেবে, কিন্তু ব্যথা বা শ্রান্তি কোনটারই লক্ষণ নেই।

দারোগা বললেন, আইচ্ছা, আইচ্ছা, ঠিহ্‌ আছে, অহন তিরডা ত খুল। গ্রামদেশের টোটকা ওষুধে তীরটা খুলে নিয়ে অনায়াসেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়, এমনকি পচনও রোধ করা যায়। কিন্তু ষষ্ঠী রাজী নয়। ক্রমাগত সে দাবী জানাতে থাকে, তার অভিযোগ লিখে নেয়া হোক, তীরটাকে প্রমাণ হিসেবে জমা নেয়া হোক এবং ম্যানেজারকে ধরে আনা হোক। ষষ্ঠীর শরীরে যথেষ্ট বল আছে, তীরটা আরো কিছুক্ষণ থাকলে তার কিছুই এসে যাবে না।

ষষ্ঠীর একঘেয়ে দাবীর সুরে বিরক্ত হয়ে দারোগাবাবু একজন পুলিশকে ডেকে তার অভিযোগ শুনতে বললেন। নেহাৎ একটা জরুরী খবর পাঠাতে হবে, তাই এত সকালে তিনি দপ্তরে এসে বসেছেন, বাড়ীতে তার অনেক কাজ আছে, গোঁয়ার ষষ্ঠীর গোঁয়ার্তুমীতে কান দিলে তার চলে না; ষষ্ঠীর শরীরে সত্যিই যথেষ্ট শক্তি আছে। আরো দু'এক ঘণ্টা তীরটা না বের করলেও কিছু হবে না। আপনিই বেটা এক সময় খুলে নেবে। আর, খুলে না নিলেই বা তার কী করার আছে?

ষষ্ঠী কিন্তু সবিস্তারে তার কাহিনী বলতে শুরু করে—হুজুর যানেন, আগে অত কইছি, আমারে বাগি দিলে কি অইব, জমিনডার উপর অহন মেনেজার বাবুর দিষ্টি লাগল, লুক লাগাইল, কিন্তুক আমি ছারি না, তহন মাইরের ডর দেহাইল।

পুলিশটি নতুন এসেছে এ অঞ্চলে, ব্যাপারটা ঠিক সে জানে না। প্রশ্ন করল, কিন্তু ম্যানেজারতো আর নিজে হাল চাষ করবে না। ষষ্ঠীর কাছ থেকে নিয়ে নিলেও অন্য কারো কাছে তো জমি বর্গা দিতেই হবে। তাহলে ষষ্ঠীর সঙ্গে এমন ব্যবহারের কারণ কী? ষষ্ঠী হাসল দাঁত দেখিয়ে। পুলিশটির নিবুদ্ধিতা দেখে, এতক্ষণের উত্তেজনার মধ্যেও তার হাসি পেল। আরে, জমি তৈরী করেছে ষষ্ঠীচরণ দু'বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে জমিটা ঠিক মত তৈরী করতে হয়েছে। তার সঙ্গে ফসল ভাগাভাগির যে সর্ত থাকবে, তৈরী জমি অন্য কাউকে বাগি দিলে তার চাইতে অনেক বেশী ফসল পাবে ম্যানেজার, এতো একটা কচি খোকাও বুঝে।

দারোগা মাথা গুঁজে রিপোর্ট লিখে যাচ্ছেন। পুলিশটি আড চোখে তাকিয়ে বুঝল, আরো কিছুটা সময় তাকে কাটাতে হবে। ষষ্ঠীকে বিদায় করা তার কর্ম নয়, আর এ অপ্রিয় কাজ সে করতেও চায় না। সুতরাং সময় কাটানোর জন্য সে নানা প্রশ্ন করে সমস্ত ব্যাপারটা জানতে চাইল! ষষ্ঠীও উৎসাহিত হয়ে উঠল। জমির গল্পের চাইতে আর কিছু প্রিয় আছে নাকি?

সোৎসাহে সে বলতে থাকে, এ অঞ্চলে চা বাগান আছে হুজুর নিশ্চয়ই দেখেছেন। চারাগুলি লাগানো হয় উপরের টিলাভূমিতে, ধাপ কেটে কেটে নীচের দিকেও নেমে আসে। কিন্তু টিলার লাগোয়া লুঙ্গাগুলি

পর্যন্ত নামে না। লুঙ্গা, যা জলোভূমি, তাতে চা গাছ বাঁচে না, কিন্তু ধানের আবাদ হয় খুব ভালো, অবশ্য বছর দুয়েকের পরিশ্রমের পর। চা বাগানের ম্যানেজাররা, বাগানে মাস কয়েকের জন্য ঠিকা কাজ করতে আসে যারা এবং বছরের বেশীর ভাগ সময়ই যাদের হাতে নির্দিষ্ট কোন কাজ থাকে না, তাদের কাছে এই লুঙ্গাগুলি বর্গা দেয়, ফসলের একটা বড় অংশই ঐ ম্যানেজাররা নিয়ে নেয়।

'মেলা বেগ পাইতে অয় হুজুর', ষষ্ঠী বলে, 'জঙ্গলা মাডি, ইয়া মুডা মুডা জুক, ধইরল্যে ছারান নাই। আর বন—সা সা কইরা গাছ বারে, হাল চলে না হুজুর, গাছের গুডা হাবল মাইরা চাইর দিয়া তুইলতে অয়, কুদাল কুবাইতে অয়।

অথচ জমি ভাল তৈরী হয়ে গেলে যখন ফলন বেড়ে যায়, তখন ছলে বলে মূল বর্গাদারকে হটিয়ে দিয়ে নূতন কাউকে এনে বসিয়ে দেয় আরো বেশী ফসল পাবার লোভে। ষষ্ঠীকেও হটানোর চেষ্টা করেছে। ষষ্ঠী অনেকবার জানিয়েছে বড় বাবুকে, কিন্তু বড়বাবু প্রমাণ পান নি। বড়বাবু ষষ্ঠীকে অনুগ্রহ করেন কিন্তু প্রমাণ ছাড়া তিনি কী করবেন ? আজ ষষ্ঠী প্রমাণ এনেছে। এ তীর বুধনের তীর, ষষ্ঠী তীরটার ফলায় সস্নেহে হাত দেয়, আর বুধন ম্যানেজারের কুত্তা, এতো বড়বাবু জানেনই।

থানার সামনে তিনদিকে বিস্তৃত মাঠ! প্রচুর রোদে সমস্ত মাঠ ভেসে যাচ্ছে। মাঠের সীমান্ত পেরিয়ে বনরেখা। থানার ডানদিকে শীর্ণকায়া পাহাড়ী নদী। লোকালয় আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সহসা দূর থেকে বোঝা যায় না।

রোদের দিকে চেয়ে দারোগাবাবু হেসে উঠলেন। তার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, বেশ ভালভাবেই তৈরী হয়েছে সব। চেয়ারে হেলান দিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে তিনি বললেন, বুঝছিত। অহন তিরডা খুল আগে.. হ, তর কেইস্টা ত ছাহন লাগেঅই।

দারোগার মুখের হাসিতে, কথার সুরে ষষ্ঠী কি বুঝল, তড়াক করে সে উঠে দাঁড়ায়, বিদ্যুচ্চমকের মত তার মাথায় খেলে যায়— তাকে কোন গুরুত্বই দেয়া হয় নি, তার অভিযোগ লেখা হবে না, দারোগাবাবু কিছুই করবেন না ম্যানেজারের। কুত্তা, কুত্তা, সব কুত্তা।

কিন্তু ষষ্ঠী সংযতভাবে উঠে দাঁড়ায়, হুজুর গরিবের মা, বাপ। কিন্তুক

ইডা অন্যায় অইল হুজুর।

ষষ্ঠী থানা থেকে বেরিয়ে আসে। সে হাকিমের কাছে যাবে। হাকিম, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনি, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেন, তিনি নিশ্চয়ই ষষ্ঠীর কথা বুঝবেন। একটানা বারমাইল, পথ রোদের মধ্যে হেঁটে ষষ্ঠী শহরে এসে পৌঁছায় হাকিমের কাছে তার আর্জি পেশ করতে।

পথে সে অনেক কথা ভেবেছে, বার বার মহড়া দিয়েছে কেমন করে হাকিমের সামনে তার কথা তুলে ধরবে। হাকিম তো আর ম্যানেজারকে চিনেন না, ষষ্ঠী একটি একটি করে নজীর দিয়ে ম্যানেজারের চরিত্র তুলে ধরবে। পাশাপাশি তার নিজের কথাও বলতে হবে বৈকি। সে বলবে কেমন করে দেশ-বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে একটুকরো জমির জন্য তার প্রাণ কাঁদত এবং তারপর জোঁক, আগাছা ভর্তি একফালি জলো লুঙ্গা পেয়ে (হোক না তা বাগিতে পাওয়া) বুকের রক্ত ঢেলে তৈরী করার পর কেমন করে তাকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র চালিয়েছে ম্যানেজার। আর বেশী বলারইবা দরকার কি, ষষ্ঠী তার দেহেই তো প্রমাণ ধারণ করে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা এমন কি হয় না, ম্যানেজারকে শাস্তি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীকেই ঐ জমি দিয়ে দিলেন হাকিম। আর বর্গাদার নয়, ষষ্ঠীই এবার থেকে মালিক, জমির মালিক। আসলেও তো ঐ জমি ষষ্ঠীর সৃষ্টি, চাষ তো সেই করছে। না কি? ষষ্ঠী পঞ্চাশ বছর এই পৃথিবীতে বাস করছে, অভিজ্ঞতা তার নেহাৎ কম হয় নি। কিন্তু কল্পনা বড় মারাত্মক জিনিষ। তীরটা ঢুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে নাতে প্রমাণ সংগ্রহের উত্তেজনায় কখন যে এত সব কল্পনা তার চাষাড়ে মাথায় ঢুকে পড়েছে ষষ্ঠী টেরও পায় নি। অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে দিবা স্বপ্ন অবশ্য মাঝে মধ্যে যে সে দেখেনি তা নয়, কিন্তু তাই বলে, যুক্তি তর্ক সহকারে এমন ভাবে কল্পনাকে সত্যির রূপ দেওয়া!

শহরে ঢুকে কৌতুহলী মানুষের সম্মুখীন হলেও বেশীক্ষণ অবশ্য তারা তাকে আটকাতে পারে নি। ষষ্ঠীর অতি সংক্ষিপ্ত, একটি মাত্র বাক্যাংশ, 'আমি হাকিমের কাছত যামু'। তাদের সন্তুষ্ট না করলেও কিছু করার ছিল না, ষষ্ঠী আর কিছু বলতে নারাজ। এখানে বলে কী হবে, যা বলার সে হাকিমের কাছেই বলবে। একে তাকে জিজ্ঞেস করে ষষ্ঠী সোজা আদালতে উঠে এসেছে।

জুন, ১৯৭৫

ঢল

পর পর তিনটে শলা নষ্ট করে ফেলল অমিয়া। একটিও জ্বলল না। তার হিংস্র ঘর্ষণে দেশলাইয়ের খোল ছিঁড়ে গেল, একটি শলা ভেঙ্গে গেল, কিন্তু আগুন জ্বলল না। ডগার ভিজে বারুদগুলো শুধু খসে পড়তে থাকল। সরমা বলল, এমনে জ্বলব না রে বউ। আমারে দে। দুইডা শলা একসনে ল, ফাপ দে। অহন ঘসা দে জুরে।

চৌকির উপর চৌকি, তার উপর কেরোসিন ষ্টোভে ভাত বসায় অমিয়া। চারদিকে ছড়ানো কিছু পুটুলী। চাল, জামা কাপড়, দরকারী, খুবই দরকারী কিছু কাগজপত্র, কিছু বাসন কোসন, খাবার জল। ঘরের সবকটি জানালাই বন্ধ। ফলতঃ একটা অস্বস্তিকর, হয়তবা, আবছায়ায় সমস্ত ঘর আবৃত।

নিশানাথ বলল, বিজু, বিজুরে নাও আইছে?

বৃষ্টির রকম দেখে অনেকেই বলাবলি করছিল, ইবার ফ্লাড না অইয়া যায় না। প্রচণ্ড খরায় সমস্ত দেশ, গ্রাম সহরের ত্রিপুরা, যখন জ্বলে যাচ্ছিল, তখন এ বৃষ্টি ছিল না। যখন এল, তখন তার রকম দেখে ভয় পেয়ে গেল মানুষ। খরায় ফাটা মাঠের হা-করা মুখগুলি প্রথম বুজল, তারপর সেগুলি কর্দমাক্ত হল, ক্রমে জল দাঁড়িয়ে গেল মাঠে। সে জল আর শুকোয় না। একদিন বৃষ্টি ধরলে, দ্বিতীয় দিন দ্বিগুণ বর্ষণে তা পুষিয়ে নেয়। আর উদ্দাম হয়ে উঠল পাহাড়ী নদীগুলি। তাদের স্ফীত শরীর থেকে অবিরাম জল নামে নীচে। ক্রমশঃই তা রাজধানী শহরের দিকে এগিয়ে আসে।

সন্ধ্যায় বিজয় এসে বলল, গতিক ভাল ঠেকতাছে না। আপে খুব বৃষ্টি হইতাছে। আওনের সময় খালেও দেখলাম মেলা জল বারছে। জলের বেগ কি জাননি?

কদিন ধরেই আলোচনা চলছিল। নানা কথার ফাঁকে, যেন দাঁতের ফাঁকে আটকে আছে কিছু, এমনি—বারবারই তাদের চিন্তা চলছিল সম্ভাব্য এক বন্যার দিকে। ফলে নূতন কিছু নয়, জানা কথা। বিজয়ের দেয়া সংবাদকে তারা এমন ভাবেই নেয়। অমিয়া বলে, অহন আর কি করবা। কাইল বেয়ানে হ্যাহ কি করন যায়। আমি কই কি পল্টুডারে আর বাবারে নি রাহন যায় কুনহানে হ্যাহ।

—এক বুড়া আর এক বাইচ্চা, সরমা বলল, দুইজনাঅই হমান। নিজের লগে না থাকলে কই পাডাইবা। যেন তারা সঙ্গে থাকলেই আশ্রয় মিলে যেত, নিশ্চিত এবং নির্ভাবনার কোন আশ্রয়।

বস্তুতঃ অচিরেই অমোঘ কতক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায় তারা। এড়ান যায় না, সমাধানও যেন নেই এমন। ধর, বন্যা যদি এবার হয়ই। আগেই কি সরে যাওয়া ভাল নয়। নির্ভাবনার না হ'ক, মরতে হবে না, এমন কোন আশ্রয়ে। কিন্তু ছেলেকে ভাত দিচ্ছিল অমিয়া, বলল, বাড়ি ঘর ফালাইয়া গেলে আর ফিরা পাইবা কিছু? কিছু নিব জলে, আর জল না অইলে, নিব জনে। কিন্তু জানটা? বিজয় বলে, জানটা গেলে?

সরমা বলে, যামুঅই বা কই ক? কুন বাড়িত ত আর জাগা মিলত না, ইস্কুল ঘর না অইলে অফিস। অই বার জাতের মেলে—আর গেলেই খাঅন দাঅন মিলব? কহন কি অইব ঠিক্ নাই—এক বাইচ্চা আর এক বুড়া লইয়া—অমিয়াও সায় দেয়; আর কন্‌না ইহানে যে মানুষডা থাকব, তার লেইগ্যা থাকতনা আর এক চিন্তা?

মরতে অয়, এক লগে মরুম।

বিজয় খিঁচিয়ে উঠে এবং স্বভাবতঃই, মরুম! মরণডা অত সহজ হইব ভাইব্য না। তিল তিল কইরা মারব। টাউনের ভিত্‌র থাকতাম্, না বাড়ী করুম। ইহানে হালা বেঙে মুতলেই বান ডাহে।

একটিমাত্র দ্বন্দ্বেই বারবার তাহা ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। প্রাণ এবং প্রাণ বাঁচানোর সম্পদ দুটোকেই একসঙ্গে বাঁচানো যায় কিভাবে? তবে কি ঐ একটিমাত্র আশা 'জল না হইলে'? মুখে না বললেও এই আশাকেই তারা আঁকড়ে ধরতে চাইছিল। হয়তবা, যেমন আগেও হয়েছে, শুধুই এখানকার বৃষ্টির জল, পাহাড়ী ঢল নয়, জল আর বাড়বে না, নেমে যাবে ইত্যাদি। কেননা, যেমন আগেও হয়েছে, খাঅন মেলন কি অতই সুজা? তোমার

সঞ্চয় কত? আর—আর, আশ্বিনের তুফানে ঘর ভাঙল, টাকা মিলল, তাও নামমাত্র, আবার যখন চৈতের তুফান। আসলেই বিজয় এসব ভাবছিল। এ সমস্তই, এই সব অভিজ্ঞতা, যেমন জল বাস্তব, তার মনে ক্রিয়াশীল হয়।
এদিকে বৃষ্টি পড়ে অবিরাম। আর জল বাড়ে। প্রতিটি মুহূর্তে জলের এই স্ফীতিকে যেন দেখতে পায় তারা। এবং যেমন কথিত, বিশাল এক অজগরের সামনে সম্মোহিত শিকারের মত তারা স্তম্ভিত, নিশ্চল হয়। এবং ক্রমশঃ ধেয়ে এসে বিস্তারিত বিরাট এ' জলরাশিকে দেখতে দেখতে হয়ত জল বাড়বে না ইত্যাদি এমন আশা মনে থাকলেও প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ সমূহ, খরার পরেই বন্যা—কিছুই আমাদের করণীই নাই, বলি আমাদের হতেই হবে—অবশ্যম্ভাবী এমন ধারণা মনে আসে। তবুও—বিছানায় যাবার আগে অমিয়া বলল, ঘুমাইবা না? অত ভাবতাছ কি? আর দশ জনার যা অইব, আমড়ার অ তাঅই অইব। বিজয় কিন্তু ততক্ষণে কাজ শুরু করে দেয়। বলে, হ্যাহি না কি হয়। কাইল দুপুরতক টাইম পামু মনে অয়। জিনিষ কিছু গুছাইয়া রাহি।
সামান্য একটু তন্দ্রামত এসেছিল বোধ হয়। আচমকা চিৎকারে সে ছিটকে উঠে পড়ে। বহু দূরে থেকে ছুটে আসা জলের শব্দটা হঠাৎই যেন আছড়ে পড়ে তার কানের পাশে। আবছা আলোয় সে অমিয়ার ত্রস্ত মুখ দেখতে পায়। অমিয়া তাকে ঠেলছিল, ওড, ওড, ঘরের দরজাত জল আইয়া পড়ছে। স্বরগুল শুনতাছ না। সরমাও উঠে পড়েছে। পল্টুও। অসুস্থ নিশানাথই শুধু এখনো বিছানায় শুয়ে। অমিয়া বলল, বাইর অইতাম গিয়া হ্যাহি উডানে হাডু জল অইয়া গেছে। হায় হায়, কি কাল ঘুমে পাইছিল গো; টেরঅ পাইলাম না। যেন টের পেলেই তার কিছু করার ছিল। এখন অমিয়ার হাত চলছে খুব দ্রুত, সরমারও, সমস্ত ঘরময় একটানা ব্যস্ততায় জীবন ধারণের সমস্ত উপকরণগুলিকে একত্রিত করছিল তারা। যেন জলের এই বেড়াজালকে ডিঙ্গিয়ে এখনই তারা কোথাও চলে যেতে পারবে, নিশ্চিত নির্ভাবনার কোন আশ্রয়ে। অথচ এমন হয় না—এমন বোধ থাকলেও, শুধুই জীবনের আদিম চালিকা শক্তি, হায় হায় শব্দের মধ্যেও, কপালে করাঘাতের মধ্যেও, জীবনের প্রতিক্রিয়া যেমন চালায়, তেমনই, আত্যন্তিক একজীবন আসক্তিতে তারা ব্যস্ত হয়। পল্টু তার বই, শ্লেট আর কবেকার কোন বিস্মৃত খেলনাকে বের করে আনছিল, বিজয় বিছানা থেকে নামতেই

সে ছুটে আসে। বলে আহ বাবা, কত জল। অহন আর জলের লেগ্যা দূরে হাইট্যা যাইতে অইত না।

দরজার কাছে এসেই বিজয় থমকে যায়। তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে নিচ্ছিদ্র মেঘ। খোলা দিক বা গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে চারিদিকেই দেখা যাচ্ছিল শুধু জল আর জল। উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব পশ্চিম শুধুই জল— বিশালকায় একটা সাদা চাদর যেন বিছিয়ে রেখেছে কেউ, চলতে যাও তার মধ্য দিয়ে, সে বড় গহীন ঠাঁই, অপেক্ষা কর, মৃত্যু শীতল অন্ধকারে সে এক সময় তোমাকে ঢেকে দেবে। চৌকাঠের কাছেই উঠোনে পল্টু একটা কাঠি পুঁতে দেয় জলে, জল বাড়লে মাপা যাবে কতটুকু বাড়ল। নিশানাথ তাকে কালই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিজয় চারদিকে তাকাল। একটা পাড়াও বলা যায় না একে। নদীর চরের মত বিস্তীর্ণ এই মাঠটাতে মাত্র সাতটা বাড়ী এদিক ওদিক ছড়িয়ে, ছিটিয়ে আছে। কিছু তাদের ঘরামির কাজ করে, আর কিছু করে মাছ বিক্রি। তারই এক প্রান্তে কিছুটা উঁচু জায়গায় তাদের বাড়ী। একটা মাত্র ঘর। বাঁশের খুঁটি, খড়ের চাল, কাঁচা ভিত। মাঝে পার্টিশান দে'য়া। চারদিকে কিছু ফল গাছ দিয়ে বাড়ীর সীমানা দে'য়া। অমিয়া যখন ডাকছিল, জল তখন কোথায় ছিল বলা যায় না, এখন উঠানে হাঁটু ডুবে যায় অনায়াসে। লুঙ্গিটাকে হাঁটুর উপর তুলে নিয়ে জল ঠেলে বিজয় কিছুটা এগিয়ে যায়। তীক্ষ্ণ মুখ তীরের মত বৃষ্টি বিঁধছিল তাকে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছিল সে। হাঁটুর উপরে জল নিয়ে, কিছুটা ভয়ে, কেননা জলের তলায় লুকিয়ে থাকতে পারে বিষধর কিছু অথবা জলের তোড়, বিজয় আবারও তাকাল চারদিকে। এখানে জল স্থির এমন মনে হয়। এই চারপাশে। অথচ জল চলছিল। মাথা পর্যন্ত ডোবা গাছে, চাল পর্যন্ত ডোবা ঘরে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, ঘুরতে ঘুরতে, যেন নৃত্যশীল, কোথাও ছোট ছোট ঢেউ, জল চলছিল। একটুকরা কাঠ, ডালপালা সমেত একটা আস্ত গাছ, আবর্জনা, সেই গতিশীলতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছিল। চারদিকের সেই নৃত্যরত ঘূর্ণায়মান ঘোলা জলরাশি, এই হাওয়ায়, ধোঁয়াটে মেঘে আচ্ছন্ন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিজয় দেখল, তার পাড়ার, যদিবা এখন বলা যায় কারণ সব একাকার; সব ঘরই প্রায় ডুবে গেছে, শুধু মাত্র চাল জেগে রয়েছে। তারই একটিতে দূরত্বে, সবচেয়ে কাছে যেটি, বিজয় একটি লোককে, লোকটিকে সে চেনে, কুঞ্জবিহারী, তার দিকে

চেয়ে হাত নেড়ে, কিছু বলতে দেখল।

হাওয়ায় এবং যেহেতু জলের শব্দ তার সমস্ত অস্তিত্বে বিদ্যমান, বিজয় প্রথমে খুবই অস্পষ্ট এবং বিন্যাসহীন কিছু শব্দ শুনে। এখন তার হাতের চেটো কানের উপর, মন ক্রিয়াশীল এবং একাগ্র। ফলে এবার সে স্পষ্টই শুনতে পায়, পরিবার পাডাই'য়া দিছি কাইল সাজেঅই। আপনে পাডাইছেন নি? মুখের কাছে দু'হাত নিয়ে বিজয় চেঁচিয়ে বলে, আমি পাডাইতাম পারছি না। নওকা দেকছেন নি কুনু?

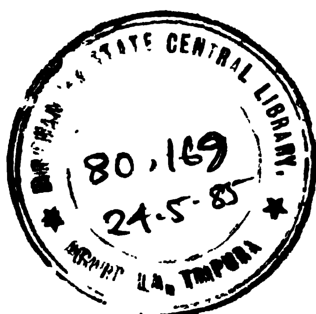
'নাও? নাও কই পাইবেন? পুলাপানে বাসাইছল এওগ্যা। ডুইব্যা গেছে। পুলাপানডি গাছে চইরা রইছে হ্যাহেন।

বস্তুতঃই তার চোখ যা চাইছিল, কোন নৌকা, পারাপারহীন এই বিশাল সাগরে পারাপারের কোন অবলম্বনই বিজয় দেখতে পাচ্ছিল না। কুঞ্জবিহারীর নির্দেশিত গাছে যেন নিরালম্ব, কিছু কালো অবয়ব ভাসছিল। অনেকটা দূরে, যেন অনন্ত পথ, বাঁধের উপর দিয়ে আরো কিছু অবয়ব চলাফেরা করছিল। আর দূরে দূরে, ইতস্ততঃ, যেন ভাসমান, চাল সমূহ, অবস্থানরত কতিপয় মানুষ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে এখন। ঘোলা পাক খাওয়া জলে বিজয় ঋজু দাঁড়িয়ে থাকে। জল ফুলতে থাকে এবং ক্রমশঃ এত বিস্তৃত আর উঁচু হয় যেন অনায়াসেই তার সুখ এবং সুখের উপকরণসহ তাদের জীবনকে তলিয়ে নিয়ে যাবে।

পল্টু তাকে ডাকছিল, বাবা জলে দাড়াইয়া কি করতাছ? জল বারতাছে হ্যাহনি। সত্যিই জল বাড়ছিল। হাঁটু ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা উপরে উঠে সে ঘরে উঠে আসে। জল এখন চৌকাঠ ছাড়িয়ে ঘরে। পায়ের পাতা অনায়াসে ডুবে যায়। ছপ ছপ করতে করতে সরমা আর অমিয়া তখনও জিনিষ গুছাচ্ছিল। বিজয় ঘরে ঢুকতেই প্রায় দৌড়ে অমিয়া তার কাছে এসে দাঁড়ায়, কি করন কও হ্যাহি। গরটা নি ফালাইয়া হ্যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো পশুর মত এক হীন অসহায়তা তার চোখে মুখে। ডুবাইয়া মারব নাহি হেসে। বিজয় বলল, হ্যাহি না কিতা অয়।

দুপুর নাগাদ জল বাড়াটা কিছু কমে। ঘরের মধ্যে তখন হাঁটু জল। কিন্তু এখন এসব কিছুই তারা ভাবছিল না। ক্রমাগত ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ কিছু যেমন ভোঁতা হয়ে যায়, তেমন, তিলে তিলে অভিজ্ঞতালব্ধ তাদের মধ্যে যে মৃত্যুভয় এতক্ষণ ক্রিয়া করছিল, তাদের অসহায়তা, কিছুই আমাদের করণীয় নেই,

এ—ই বোধ এখন অন্তর্হিত প্রায়। আসলে সচেতন কোন বোধই নয়, অন্তহীন যে জীবন তাই শুধু তাদের চালিত করে। এই জীবনকেই রক্ষার জন্য তারা যন্ত্রের মত কাজ করে যায়। দু'কোঠায় দু'টো চৌকি। একটিকে তারা আরেকটার উপর উঠায়। তার উপরে কাপড় চোপড়, বাসন কোসন, কাগজপত্র, চা'ল তুলে। কেরোসিন ষ্টোভে অমিয়া ভাত বসায়। নিশানাথ একপাশে শুয়ে থাকে। পল্টু অমিয়ার কোলের কাছে। আর তারা অপেক্ষা করে। অপেক্ষা করে ভাত হবার। জল নামা বা নৌকা আসার বা আরো। জল বাড়লে চালে উঠার চিন্তা তো পরের।



শিয়াল

সকাল বেলা মুরগীর ঘর খুলে নিবারণ টের পায় একটা মুরগী কম। সবচেয়ে বেশী ডিম দেয় যেটা, সেটাই নেই। আগের দিন বাজার থেকে ফিরতে তার সন্ধ্যা পার হয়ে গেছল। মালতীই মুরগীগুলোকে ঘরে ঢোকায়। হয়ত ঐ মুরগীটাকে ঢোকাতেই ভুলে গেছল মালতী। রাগে ফুলতে ফুলতে নিবারণ মালতীর সামনে এসে চেঁচায়, চোকের মাথা খাইছছ নিহি? মুইগ্গা-ডারে কাইল ঢুকাইছিলি? তার জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে নয়, বড় মুরগীটা নাই শুনেই মালতীর চমক লাগে। আ-ধোয়া হাত নিয়েই দৌড়ে সে মুরগী ঘরের সামনে যায়। নিবারণ আসে পিছে। মুরগীগুলি ততক্ষণে উঠানময় ছড়িয়ে পড়েছে। মালতী চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে প্রথমে মুরগীগুলোকে দেখল, তার পর গুনল। কিন্তু কোন হদিস্ মিলল না। হয়ত অসুখ করে পড়ে আছে ঘরের কোণে, মালতী এবার ভিতরে উঁকি দেয়। হাত দেড়েক উঁচু মাটির দেয়াল, তার উপরে তরজার বেড়া দিয়ে মুরগীর ঘর। নিবারণ আগড়টা সবটা খুলে নি, মালতী ঠেলে একপাশে সবটা সরিয়ে দিল। আর তখনই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। পুবদিকের বেড়ার গায়ে বেশ বড় একটা ফোকর, ফোকরের গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট পালক লেগে আছে। বেড়াটা ক'দিন ধরেই সারাবে ভাবছিল নিবারণ। অবসর মিলছিল না। আজ তার মাস্থল দিতে হল।

'হালার হারামজাদাডা আইল কহন? ইস্।' মুরগী হারানোর শোকে নয় টের না পাওয়ায় নিবারণের রাগ হতে থাকে বেশী। তাই মালতী যখন বলে 'হ, হেস্‌রাইতে য্যান জটপটানি হুনছিলাম, তখন তার উপরই সমস্ত রাগটা ফেটে পড়ে। মালতীর মাথার চুল খামচে ধরে নিবারণ বলে, হুনছিলাম, ক্যান ডাইক্যা তুলতে পারছিলি না আমারে। বজ্জাত মাগী, খাইবি আর ঘুমাইবি, ঘুমাইলে আর হুস থাহে না।'

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। শেষ রাতে মুরগীগুলোর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাঁধে। হুটোপুটি হয়। ধূর্ত শেয়াল এরই সুযোগ নিয়েছে। হয়ত দুটি এসেছিল। একটির কাঁধে আর একটি ভর দিয়ে বেড়া ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেচে। মুরগীগুলোর পাখা ঝাপটানোর আওয়াজের আড়ালে নিজেদের কাজ হাসিল করে নিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে নিবারণকে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নিবারণ। মেজাজটাই খিঁচড়ে গেছে। মুরগী কমতি পড়াটা আর মোটেই বড় মনে হয় না তার কাছে। হাঁস, মুরগী ছাগল পালতে গেলে, শিয়লের আক্রমণটাও স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হয়। অতি ধূর্ত, কুৎসিত এই জীবটা এমনকি মানুষের কচি বাচ্চাও সুযোগ পেলে ঘাড়ের কাছে কামড়ে ধরে তুলে নিয়ে যায়। নিবারণরাও সতর্ক থাকে। ফাঁদ পেতে, বিষ মাখা মাংসের টুকরা ছড়য়ে রেখে, তারাও তেমনি ধরতে চায়, মারতে চায় তাকে। এবার নিবারণ সতর্ক থাকে নি, তার অসাবধানতাকে কাজে লাগিয়েছে শিয়াল। আপশোষ তার এ কারণেই।

আস্তে আস্তে রোদ চড়তে থাকে। আশ্বিনের প্রথম। শেষ রাতের হিমেল হাওয়ায় এখন পাতলা কাপড় গায়ে দিতে হয়। গাছের পাতায়, ঘাসের উপর শিশির জমে, ঝোপে ঝাড়ে, লুঙ্গার বুক জুড়ে কুয়াশা ঘন হয়। কিন্তু সূর্য উঠার পর বেলা যত বাডে কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদে গা চড়চড় করতে থাকে; কিছু পেঁজা তুলার মত সাদা মেঘ ঘন নীল আকাশের নীচে, অকরুণ সূর্য প্রচণ্ড তাপ ছড়ায়! কাঁঠাল গাছের নীচে ছায়ায় বসে নিবারণ বাঁশ চাঁচে। বেড়াটা আজই সারাতে হবে। একটা ফাঁদও বানাতে হবে। একটি দুটো মারতে পারলে কিছুদিন উপদ্রবটা বন্ধ থাকে। নয়ত সাহস বাড়লে, দিনমানেই হয়ত জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে এসে টক্ করে আরেকটা মুরগী নিয়ে যাবে। বাঁশ চাঁচতে চাঁচতেই নিবারণ সামনের জঙ্গলটার দিকে তাকায়। লুঙ্গা জুড়ে ঘন জঙ্গল, লতার ঝোপ। ছোট ছোট বাঁশ ঝাড়, উলুছন মাঝে মাঝে কয়েকটা লম্বা গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গল এত ঘন, প্রখর সূর্য কিরণও খুব কমই সেখানে ঢুকতে পারে। আদিম অন্ধকারে শিয়াল, খরগোস, সরীসৃপদের আনাগোনা; প্রথম দিকে ছোট-খাট বাঘও বেরোতো এখান থেকে। এই জঙ্গল থেকেই নিবারণ তার জ্বালানী সংগ্রহ করে। বড় গাছ কাটার নিয়ম নেই, ফরেষ্ট গার্ড টের পেলে

জরিমানা নির্ঘাৎ। মাঝে মধ্যে সংগোপনে অবশ্য দু একটা মাঝারি গাছ কেটে নেয় নিবারণ, কিন্তু সে খুবই কম। শিয়ালের দল আসে ঐ জঙ্গল থেকেই।

শুধু লুঙ্গায় নয়, লতায় পাতায় ঝোপ আর আম, কাঁঠাল, চামল, দেবদারু গাছে সারাটা অঞ্চল জুড়েই এমন জঙ্গল। এই জঙ্গল কেটেই নিবারণদের বসতি। দ্বীপের মত জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে ঘর বাড়ী, সরু দু'পেয়ে বড় জোর হাত তিনেক চওড়া এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। লাল মাটির টিলা ভূমি। জল মেলে অনেকটা নীচে। লুঙ্গায় বা তার কাছা-কাছি কুয়ো খুঁড়ে, বা আরও কিছুদূর গিয়ে, যেখানে টিলা ঢালু হতে হতে বিস্তীর্ণ এক উপত্যকায় গিয়ে মিশেছে। উপত্যকা জুড়ে বিল। নিবারণদের পাড়ার হাঁস চড়ে সেখানে, সেখানে স্নান হয়, শীতে বা প্রখর গ্রীষ্মে কুয়োর জল অনেক নীচে নেমে গেলে, রান্না খাওয়ার জলও আনতে হয় ঐ বিল থেকে। সবে মাত্র বেড়াটা বানিয়ে তুলেছে নিবারণ, ছায়াটা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, গরমের হল্কা লাগছে মাঝে মাঝে, এমন সময় নিতাই এল।

'কেমুন আছ নিবারণদা', নিবারণ অপ্রসন্ন মুখ তুলে তাকায়। আবার এসেছে দালালটা। নিতাই এ পাড়ারই ছেলে, বাপ মরার পর বখে গিয়েছিল, বাজার এলাকায় চুরি চামারি করে জেলও খাটে কয়েক মাস। জেল থেকে বেরিয়ে এখন জমির দালালি ধরেছে। নিবারণদের জমির দাম বাড়ছে। শহর বাড়ছে। কারখানা হচ্ছে, মাইল দুয়েক দূরে। অফিস হচ্ছে. কুলি কামিনদের ডেরা বসছে। আফিস বাবুদের কোয়ার্টার তৈরীর কথা চলছে। জায়গা চাই। এদিকের জায়গা ধরে রাখতে পারলে সোনার দরে বিকোবে পরে। ক্রমশঃই নিবারণদের দিকে হাত এগিয়ে আসছে। কড়কড়ে টাকা নিয়ে নিতাই ঘোরাফেরা করে।

নিতাই বলল, বিনুদ্দার জমিডা বিক্কির অইয়া গেল নিবারণ দা, কাইল কোর্টে গেছলাম, দলিল অইয়া গ্যাছে।

তয় আমারে শুনাইতাছছ্ ক্যান, নিবারণ বলল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে নিতাইয়ের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে, চোখের দিকে তাকায়, আমারে ফুস মন্তর দিতাছছ্ নিহি? আমি বেচুম না কইছি না।

সরাসরি আক্রমণে নিতাই খানিক অপ্রস্তুত হয়ে যায়, বিনোদের ব্যাপারে কিছুটা তাড়াহুড়া হয়ে গেছে বটে, এমন করে অবস্থার সুযোগ নেওয়াটা ঠিক

হয়নি, বলেও ছিল সে গোবিন্দ পালকে, কিন্তু এছাড়া উপায়ও ছিল না। দেশ ছেড়ে এসে, এই টিলা জঙ্গলের দেশেও বিনোদ এমন করে মায়ার শিকড় নামিয়ে দিতে পারে জমির ভেতর, নিতাই কল্পনা করতে পারেনি। শেষ অব্দিও নিতাইয়ের হাত ধরে অবুঝের মত বলেছে বিনোদ, ট্যাহাডা সুদ দিলে জমিডা ফিরয়া পামুনি নিতাই? নিতাই যে নিতাই, সেও সরাসরি তাকাতে পারেনি বিনোদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে অস্পষ্টভাবে মাথা নেড়েছে। নিবারণের কথায় আচমকা সে দৃশ্যটা তার মনে পড়ে যায়। কেমন ভিজে ন্যাকড়ার মত হয়ে যায় বুঝি মনটা। মাটিতেই উবু হয়ে বসে পড়ে নিতাই, আবেগ মথিত কণ্ঠে বলে নিবারণদা, জমি তুমরা কোন মতেই রাখতে পারতা না। আমারে তুমরা গিন্না কর, আমি দালালি করি, আমি লোকেরে ফুসলাই কিন্তুক, নিবারণদা, আমি না করলেও জমি তুমরার যাইবঅই, তুমরা জাননা এরা কত যড় করতে পারে। নিবারণ চুপ করে থাকে, নিতাই মিথ্যে বলে নি। বিনোদকে কিভাবে পাকে জড়িয়ে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেছে গোবিন্দ পাল, নিবারণ জানে বৈকি!

নিতাই বলে, গুবিন পালরে না অয় ঠেকাইলা, কিন্তু কাঞ্চন সারে? কাঞ্চন সা তুমারে তাগাদা দিল বইল্যা। শুদু তুমারে না, রসিক্যা, বনমালী এরারেঅ টান দিব। সবডা জমি গিল্যা পরে সোনার দরে বেচব। আমাদেরঅ কি আর পরে রেয়াত করব?

একঘেয়ে, কিছুটা নীচু স্বরে আত্মকথনের মত নিতাই কথা বলে। করুণ চোখে তাকায়, নিবারণ অস্বস্তি বোধ করে। তার প্রতি মুহূর্তের ভাবনা চিন্তাকেই বাইরে টেনে এনেছে নিতাই। একটা বাঁধন ক্রমশঃ চারপাশ থেকে তাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে, নিবারণ বুঝে, টের পায়; অথচ কিছুই তার করার নেই। কিছুই সে করতে পারে না। শিয়ালের মুরগী নে'য়া টের না পেয়ে যে জালা ধরা, টের পেয়েও কিছু না করতে পারায় তার চাইতেও বেশী জালা ধরে নিবারণের শরীরের ভেতরটা পুড়তে থাকে।

আমি যাই নিবারণদা, নিতাই বলল, টাউনে যামু। ভাবলাম কয়ডা কতা কইয়া যাই নিবারণদার লগে। কিন্তুক কুন কতার থিক্যা কুন কতায় আইল্যাহ। নিতাই চলে গেল। দ্রুত হাতে নিবারণ কাজ করতে থাকে। যন্ত্রের মত। মাথার ভেতর ভাবনা চিন্তাগুলি পাক খেয়ে বেড়ায়। বেলা একটু বাড়তেই চারদিক কেমন ঝিম্ মেরে আসছে। কিছু কিছু হাঁস, মুরগী, ছাগল,

পাঁঠা, কুকুর, গরুর ডাক আর পাখীর ডাক ছাড়া লোকজনের বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। বড় বড় গাছের নীচে, লতা পাতার ঝোপঝাড় গায়ে জড়িয়ে টিলাভূমি যেন কচ্ছপের মত পিঠ মেলে দিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। কিছু শাপলা লতা হাতে ঝুলিয়ে লুঙ্গাটার দক্ষিণ দিক থেকে মালতী উঠে আসে। ভিজে কাপড় শরীরে জড়িয়ে আছে। বিলে গিয়েছিল সে। নিবারণের কাছে এসে সে বলে হুনুছনি, চাইল আনতে অইব। নিবারণ কথা বলে না, কিছুক্ষণ দ্রুত কাজ করার পর এখন হাত পা কেমন যেন শিথিল হয়ে এসেছে তার। রোদের তেজ একটু একটু করে বাড়ছে। একটি বাঁশের কঞ্চি আর দা'টা নিয়ে সে কাঁঠাল গাছের তলা থেকে ঘরের পৈঠায় এসে বসে। অনেক্ষণ ধরে একটি মাত্র কঞ্চিকেই চাঁচতে চাঁচতে সে কাঞ্চন সা', গোবিন্দ পালের কথা ভাবে। এই হাঁস, মুরগী, ছাগল, পাঁঠা কেনার টাকা তারাই যুগিয়েছিল। সরকার থেকে বসত জমি আর জঙ্গল কাটার কিছু টাকা দিয়েছিল। জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তুলেছে তারা। কিন্তু দু'একজন ছাড়া স্থায়ী কোন জীবিকাই তারা নিতে পারেনি। লাঙ্গল চষে বীজ বুনে, ফসল ফলাবার পরিবর্তে দা, কোদাল নিয়ে মাইল দুয়েক দূরের বাজার এলাকায় গিয়ে বসেছিল কিছুদিন। সামান্য বাড়তি জমিতে, ঘরের আনাচে কানাচে কিছু তরি-তরকারী ফলিয়ে, আম কাঁঠাল বিক্রি করে, চুরি করে গাছের ডাল কেটে লতা পাতার বোঝা বেঁধে বাজারে বিক্রি করেও চেষ্টা চলে। কিন্তু ফুটো বন্ধ হয় না। অভাবের শত ফুটো দিয়ে জীবনের শক্তি ক্রমশঃই গলে গলে পড়ে। কাঞ্চন সা', গোবিন্দ পাল এমনি সময়ে বাড়তি টাকা ধরে দেয় তাদের হাতে। তারা কৃতজ্ঞ বইকি! কিন্তুক ·· ভ্রু কুঁচকে আসে নিবারণের। আপন মনে ঘন ঘন নাড়তে থাকে সে। না। না।

মালতী আড়চোখে নিবারণকে লক্ষ্য করে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে মানুষটা। ক'ট মাত্র বছরেই অমন পাথরের মত শক্ত শরীরটা কেমন দুমরে মুচড়ে গেছে। দুটো মুরগী রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল, তাড়িয়ে নিয়ে এসে মালতী আবার বলে, হুনুছনি, বাজারে যাইতে অইব, চাইল নাই।

নিবারণ উঠে দাঁড়ায়। আর দেরী করা চলে না! মালতী গতকালই চালের কথা বলেছিল। আনা হয়নি। পয়সাও ছিল না। ভেবেছিল যা হোক করে চলে যাবে হয়ত। আজ আনতেই হবে। একটা মুরগীই বিক্রি করতে হবে। নিবারণ মনে মনে হিসাব করে। বড় শক্ত হিসাব,

ওদিকে টানলে, এদিকে পড়ে টান।

মালতী বলে, রঙ্গিডারে নিয়া যাও। ডিমঅ দেয় না, রোগাঅ অইয়া যাইতাছে যেমুন। নিজেই সে ধরে এনে দেয় মুরগীটা। পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগীটা ঝুলিয়ে নেয় নিবারণ। গামছাটা কাঁধে ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। উল্টোদিক থেকে রসিক এসে উপস্থিত হয়। বলে, বাজারে যাইতাছ নিহি নিবারণদা, চল আমিও যামু।

মোটামুটি চওড়া একটি পিচ ঢালা রাস্তা রাজধানী শহর থেকে এসে নিবারণদের পাড়াকে বাঁয়ে রেখে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। নিবারণদের পাড়া থেকে মাইল খানেক দূরে এই রাস্তারই দুপাশে বাজার। পাকা ভিত, টিনের চাল, কাঁচা ভিত, খড়ের ছাউনী—ছোঠ বড় এমনি দশ বারটা ঘর রাস্তার দু'পাশে, এক পাশে আছে সামান্য খড়ের ছাউনি দেয়া ছোট ছোট আরও কয়েকটি চালা— এই নিয়ে বাজার। সপ্তাহে একদিন হাট বসে। দূর-দূরান্ত গ্রাম থেকে অনেক শাক সব্জি, ডিম, হাঁস, মুরগী, ছাগল পাঁঠা, গরু ইত্যাদি আমদানী হয়— এখান থেকে চালান হয়ে যায় চৌদ্দ পনেরো মাইল দূরের রাজধানী শহরে। বাজারের মাঝামাঝি এসে নিবারণ বলল, হালার হকুনডা গদীত রে। মুরগীডা তুর ঠেঙ্গে রাক্। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। কাঞ্চন সাহার কর্মচারী এসে ধরল, বাবু তোমারে ডাকতাছে, নিবারণ।

মোটামুটি মাঝারি সাইজের একটি নীচু চৌকির উপর ময়লা একটি সাদা চাদর পাতা। চৌকির মাঝামাঝি ছোট একটি হাত বাক্স। হাত বাক্সের পিছনে কাঞ্চন সাহা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তার পেছনে লোহার আলমারি। কাঞ্চন সা'র পরনে হাঁটুর উপর ওঠা ধুতি। গায়ে গেঞ্জী। গদীর ডানপাশে বিরাট একটি ওজন পাল্লা ঝুলছে। নেংটি পরা, তেল চিট্‌চিটে গেঞ্জি গায়ে একটি পশ্চিমা কুলি দাঁড়িয়েছিল পাল্লার দড়ি ধরে।

কাঞ্চন সা' বলল, কিতা নিবারণ, দ্যাহি না যেমুন কয়দিন। গেছলা কুনহানে? নিবারণ বলল, না বাবু, কাইল সাইনজা বেলাঅত আপনের দুকানের সামনা হইয়া গ্যাছি।

অ, কাঞ্চন সা বললেন, তর একটা খবর পাইলাম, গুবিন নাহি বিষুদের জমিডা কিন্যা লাইছে? তুমরা কিতা ভাবতাছ, কিতা রসিক? আরে বেইচ্যা দেও, যাইতে ত অইবই একদিন।

রসিক কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের ঝুলন্ত মুরগীটা একবার পাখা

ঝাপটে উঠে।

নিবারণ বলল, দ্যাহি কিতা করি।

কাঞ্চন সা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিবারণকে লক্ষ্য করছিলেন। নিবারণের ভাবান্তর তার চোখ এড়ায় নি। মুহূর্তের মধ্যে তিনি কথার ভোল পাল্টে দিলেন। যাকগা, যা অইবার অইব। অহন কিতা মনে কইর‍্যা? মুরগী বেচতা আইছ? আমারে দিয়া যাও।

চকিতে নিবারণ রসিকের দিকে ঘাড় ফেরায়। এর মধ্যেই দেখে ফেলেছে কাঞ্চন সা'? এত চতুর? মরীয়া হয়ে সে বলে, মুরগীডা আমার না বাবু, রসিক্যার। আমার মুইন্যাডারে বাবু কাইল হিয়ালে লইয়া গেছে।

কাঞ্চন সা' বিন্দুমাত্র না দমে বললেন, রসিকার অইলেও চাইতাম, কিন্তু রসিক্যারে লইতে এনা দিছ। হাতে থাকলেই অর অইল? নেও নেও দুই টাহা পাইবা, দিয়া যাও।

নিবারণ বুঝল ধরা পড়ে গেছে, লুকোচুরি করে লাভ নেই।

না বাবু, চাইর টাহার কম অইত না।

তবে যে তুমার না কইছ? আইচ্ছা যাও তিন টাহা দিমু।

না বাবু, চাইর টাহা।

কাঞ্চন সাহা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছিল নিবারণকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিনি নিবারণের চোখের দিকে চাইলেন। নিবারণ চোখ নামাল না।

ঠিক আছে, চাইর টাহাই পাইবা! রাইখ্যা যাও।

নিবারণ বলল, অহনঅই দেন বাবু, চাইল কিনতে অইব।

কাঞ্চন সাহা সত্যিই সংযমী পুরুষ। একটু হেসে চারটি ময়লা নোট নিবারণের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, অত রাগ কর ক্যান নিবারণ? দিনকাল বড় খারাপ আইতাছে। একটু সামলাইয়া চইল্য। না খাইয়া মরবা হেশে।

নিবারণ বলে, না বাবু, পাতরের কইলজা আমরার। অত অহজে মরুম না ত্বাহেন না, দেশ গা থিক্যা বানের জলে ভাইস্যা আইলাম। জমি গেল, বা পিতাম'র ভিটা গেল, অহনঅ কেমুন হাঁস, মুরগী পাইল্যা বাইচ্যা রইছি তবে হ,' আপনেরা দয়া করেছেন।

কি স্পর্ধা। বুঝি ব্যঙ্গ করল কাঞ্চন সা'কে। কোথায় থাকত আজ......

একটু তিক্ত হেসে কাঞ্চন সা বললেন, 'সরকার দয়া কইরা ঘর তুলনের জমি

দিছে বইল্যা বাইচ্যা গ্যাছ। আমার টাহাডা কবে দিতাছ। সুদ কত অইছে জাননি? টাহা না পাইলে কিন্তুক তুমার ঘর বাড়ী নিলামে চড়ামু। হ্যাঁ। মাথার উপরে সূর্য নিয়ে নিবারণরা গদী থেকে বেরোল। এখনও তার বাজার করা বাকী আছে। চাল, লবণ। আরও একটা দিন চলে যাচ্ছে। কেমন ক্লান্তিকর, অথচ কেমন দ্রুত। যেন সজাগ হয়ে ফিরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কেউ পকেট কেটে দিচ্ছে, চুরি হয়ে যাচ্ছে দিনটা। শেয়ালের মুরগী নেয়ার মতই? হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ল নিবারণ, অবসন্ন। কাঞ্চন সাহা মিথ্যে শাসানি দেয় নি। কে জানে কি হবে? এখন মনে হয় ধার না করলেই হয়ত ভাল হত, বিশেষতঃ ঐ কাঞ্চন সা'র কাছ থেকে। ব্যাটা হাড় বজ্জাত। নিবারণ থু থু ফেলল। কণ্ঠতালু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে—গরমে, ক্ষুৎ পিপাসায়।.. কিন্তু হাঁস মুরগী কেনার টাকা আর কার কাছে পেত নিবারণ? শুধুত নিবারণ নয় এই রসিক, বিনোদ, বনমালী সবাইত টাকা ধারে ঐ কাঞ্চন সা'র কাছে। টাকা, টাকা, কত টাকা করেছে কাঞ্চন সা'? যাবে নাকি নিবারণ? বলবে, ইবারেরডা মাপ কইরা দ্যান না বাবু, আপনের ত মেলাই টাহা। নিবারণ হাসল, কাঞ্চন সা'কে সে চেনে না? তবে?

রসিক নিবারণের মুখে অস্পষ্ট হাসি দেখে অবাক হল, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। একটি বাস এসে দাঁড়িয়েছে পথের ধারে। অনেক লোক। অনেক লোকের আনাগোনা এখন এদিকে। শহর বাড়ছে। কারখানা হচ্ছে, অফিস। আশপাশের টিলার জঙ্গল সাফ হয়ে নতুন বসতি গড়ে উঠছে এদিক ওদিক, ধানি জমি ভরাট করে বাড়ী উঠছে রাস্তার দু'পাশে। জায়গা ছেড়ে দিতে হবে নিবারণদের। বিনোদ চলে গেছে। নিবারণদেরও পালা এল বলে। কাঞ্চন সা, গোবিন্দ পালরা তৈরী।

একটা ঘরের মধ্যে নিবারণ চাল, লবণ কেনে। এবং রসিকের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে রোদের মধ্যে। ঘামে জব জব করে শরীর। কিন্তু নিবারণের আচ্ছন্ন চেতনায় রোদ আর ঘামের অস্বস্তিকর অনুভূতি বিন্দুমাত্রও সাড়া জাগায় না।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ যেন নিবারণের একটা কথা মনে পড়ে যায়। বাম হাতে গামছায় বাঁধা চাল, লবণের পুঁটুলি। পুঁটুলিটা কিছুটা তুলে গামছার খোলা প্রান্তটা দিয়ে ঘাড়, গলা মুছে সে বলে, কি কছ রসিক্যা? সরকার কি কাঞ্চন সা'রে আটকাইব না?

আচমকা প্রশ্নে রসিক বিভ্রান্ত হয়ে যায়। নিবারণের ভাবনা চিন্তার খেই ধরতে পারে না সে। বলে, কি কইছ বুজ্‌ছি না নিবারণদা।

নিবারণ কোন উত্তর দেয় না। দ্রুত হেঁটে চলে। সূর্য কিছুটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। ধুলোর ঝড় উড়াতে উড়াতে শহরের দিকে চলে যায় একটা দৈত্যাকার ট্রাক।

বাড়ী ফিরে নিবারণ ফাঁদটা শেষ করতে বসে। শেয়ালটা আজকেও আসবে সুনিশ্চিত।



রোশনাই

যেখানে থামার সেখানে না থেমে রাস্তায় চাকা ঘষতে ঘষতে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বাসটা থামে। ইঞ্জিনের একটানা ঘড় ঘড় আওয়াজ আর কণ্ডাক্টরের তাগাদার মধ্যে শক্ত করে মেয়ের হাত ধরে নামতে নামতে গোবিন্দ বলে, সিকডাত ধইরা নামিছ বউ, বলতে বলতে সে ই প্রায় পা হড়কায়। একটা ধাপ ডিঙ্গিয়ে সরাসরি মাটিতে পা দিয়ে ফেলে সে। পা-দানিটা নীচু বলে এবং বউ এক হাতে রড ধরে অন্যহাতে তাকে সামলায় বলে গোবিন্দ উল্টে পড়ে না। বাস ছেড়ে দিলে বউকে ধমকায়, অত্তডি মাইনসের সামনে তুই আমারে লাজ দিলি বউ? যেন আছড়ে পড়লে তার ক্ষতি ছিল না। বউ বলে হ, আছাড় পইর‍্যা আড্ডি না বাংলে অইব ক্যামনে?

মাটিতে পা দিয়ে গোবিন্দ রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এতক্ষণ বাস ছিল বলে দেখা যায়নি, এখন বাস চলে গেলে দেখা যায়, সামনে রাস্তার পুব পাশে উঁচু একটি দেউড়ি নির্জন দাঁড়িয়ে আছে। আবছা অন্ধকারে ভৌতিক। ঢোকার পথে জল কাদা জমে আছে। তার বাঁপাশে কয়েকটা ছোট চালাঘরে চা, পান, বিড়ির দোকান। টিমটিমে আলো নিয়ে দেউড়িটির পাশে মানানসই, ডান পাশে ধূসর দে'য়াল। রাস্তার এদিকে কিছুটা দূরে ভাঙ্গা যেন হাঁটু মুড়ে বসা কয়েকটা বাস, একটা আস্ত ট্রাক, তাদের ভিতরে, চার পাশে চাপ চাপ অন্ধকার শুয়ে। বাঁ দিকে বেশ কিছুটা দূরে রাস্তা এবং তারপর অনেকটা বিস্তৃত জায়গা পেরিয়ে দক্ষিণমুখী আরেকটি দেউড়ি। তার নীচে দুয়েকটা কালো অবয়ব চলাফেরা করছে। সামনে পিছনে যদিও অনেক আলো, তবু দেউড়ির আর তার সামনের চত্বরের বিস্তীর্ণতায় আলো অপ্রচুর মনে হয়। ফলতঃ এখানে অন্ধকার আর আলোয় মাখামাখি। মণ্ডলের কাজে বা মণ্ডলের সঙ্গে গোবিন্দ মাঝে মাঝে এদিকে আসে। দেউড়ি পেরিয়ে, গোবিন্দ

আঙুল তুলে মেয়েকে দেখায়, অই ছ্যাহ্‌খ রাজবারি। এখন গোবিন্দের পাশে ট্রাফিক পুলিশ সিগন্যাল দেখায়। একটি গাড়ী আসতে থাকে। হেড্‌লাইটের আলোয় তাদের আলোকিত করতে করতে সাঁ করে গাড়ীটি বেরিয়ে যায়। কয়েকজন মহিলাসহ একদল বিভিন্ন বয়সের পুরুষ তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। গোবিন্দ মেয়েকে নিয়ে দেউড়ি পেরোয়। রাজপ্রাসাদের অনেক সিঁড়ি। গোবিন্দ এখানে কোনদিন ঢুকেনি। সিঁড়িগুলি একের পর এক উপরে উঠে। উঠেই। দুপাশে আশ্চর্য নীরবতা। উঠতে উঠতে এক সময় বন্ধ দরজার সামনে এসে সিঁড়ি থেমে যায়। গোবিন্দের মেয়ে সামনে, পাশে, রাজবাড়ির দিকে তাকায়। রাজবাড়ির চূড়ায়, দেউড়িতে, রাস্তা জুড়ে আলো জ্বলছে, নীলাভ আলোয় জলে ভেজা কালো পীচের পথ, যেহেতু কিছুক্ষণ আগে মাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সাপের পিঠের মত। যেন পরে দেখা যাবে, বা বন্ধ দরজার সামনে গোবিন্দ বিষন্ন বলে মেয়ে বেশীক্ষণ এসব দেখে না। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে, রাজবাড়িকে পাশে রেখে, গোবিন্দের হাত ধরে টান দিতে দিতে বলে, আইঅ না বাবা।

গোবিন্দ মেয়ের হাত ধরে এগোয়। লাল ফিতে দিয়ে মেয়ের চুল বাঁধা। গায়ে হলুদ ফুল তোলা ফ্রক, কিছুটা কুঁচকে আছে অতিরিক্ত ব্যবহারে এবং পুরোণ বলে বিবর্ণ। পিছনে তার বউ, চওড়া ম্যাড়ম্যাড়ে লাল পাড় কাপড়ে খোঁপা বাঁধা মাথায় ঘোমটা। এসব তাদেরই জন্য, এই আলোর উৎসব, এই আয়োজন, যেহেতু মণ্ডল বলে, গুবিন, দেইখ্যা আইঅ গিয়া, তুমার আমার লেগ্যাইত এগুলান—গোবিন্দ আলোর তোরণ পেরিয়ে সটান সামনে এগিয়ে যায়।

সামনেই পুকুর। চারধারে রেলিং দেওয়া। টলটলে জলে, আলো আঁধারিতে ছপাৎ ছপাৎ শব্দে বৈঠা ফেলে নৌকা চলছিল। জল বিহার করছে একদল বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ. পাড়ে অপেক্ষমান অথবা শুধুই দর্শক ও বেশ কয়েকজন। গোবিন্দ রেলিংয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে, ঝুঁকে তার মেয়ে, বউ নৌকার আরোহী, আরোহিনীদের দেখে। এখন দু'দিকে জুটো পথ। গোবিন্দের পাশেই বাঁদিকে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ। এদিকটা প্রায় অন্ধকার। আলাদা কোন আলো নেই বলে অন্ধকার দূরীভূত নয়, তবে বিক্ষিপ্ত আলোয় তা জমাটও নয়, অনেকটা তরল! পুলিশগুলো থেকে একটু তফাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

আঁচলে আঙুল জড়িয়ে ঠোঁটের কাছে নেয়া, মাথাটা একটু ঝুঁকে। 'যেন মুচকী মুচকী হাসছে মেয়েটি' পুলিশগুলো সিগারেট ফুঁকছে, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে, নিজেদের মধ্যে, মেয়েটির সঙ্গে, কখনও হাসছে বা। রেলিংয়ের গায়ে ঠেস্ দিয়ে বসে আছে কয়েকটা ভিখিরী, একটা উর্দ্ধমুখ, কাঠির মত, উলংগ শিশু অবাক হয়ে পুলিশগুলোকে দেখছে। কাছেই অনেকটা উঁচুতে বিরাট এক পোষ্টার আটকানো,···দেশের সম্পদ···গোবিন্দের পেছন দিয়ে হুস্ করে একটা গাড়ী ডান দিকে এগিয়ে গিয়ে থামে, আসুন, আসুন, কে যেন প্রায় দৌড়ে আসে, গাড়ীর দরজা খোলার, বন্ধ করার শব্দ, চটুল হাসি, হঠাৎ কাকে দেখে পুলিশগুলো সটান দাঁড়িয়ে যায়। গোবিন্দ ঠিক বুঝতে পারে না কোন দিকে যাবে। মাইকে গান ভেসে আসে, লাল, নীল, হলুদ আলো জ্বলে, জ্বলে·নেভে, জলের ঢেউয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়। গোবিন্দ ডানে, বায়ে তাকায়, পুলিশগুলো তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। নৌকার শব্দ, জলের শব্দ, মাইকের আওয়াজ, কথা বলা, গান—যোগহীন, বিচ্ছিন্ন—অথচ যেন এক হয়ে জলস্তম্ভের মত ফেটে ফেটে পড়তে থাকে তার সামনে। এত জন, অথচ যেন মানুষ নেই, কাকে সে জিজ্ঞেস করবে, এমন অসহায়তা, গোবিন্দ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। এবং এসবই আমাদের জন্য, এমন যে চালিকাশক্তি, গত প্রায় হয়।

গোবিন্দ বলে, কুন দিগ দিয়া যামু ক'ত বউ? দুদিকেই মানুষ চলছিল, তথাপি ডানদিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন, আসলে বাদিক থেকেই সমস্ত শব্দ আসছিল, চিৎকার, ঝুমঝুমি, মাইকের মধ্য দিয়ে আসুন, আসুন আহ্বান এবং তৎসহ চটুল হিন্দী, বাংলা গান। মালতী দুদিকেই পর্যায়ক্রমে চাইতে চাইতে উত্তর দেয়, অইদিগেত ম্যালা এ না, মণ্ডল যে কইছ্‌ল···

'মণ্ডল কি কইছ্‌ল?'

'তুমার আমার লেইগ্যা···'

'গোবিন্দ ডান দিকে ঘোরে।' পুবে, উত্তরে, পশ্চিমে একের পর এক প্যাভেলিয়ন। কয়েদীর বোনা বেতের ঝুড়ি। একের পর এক প্যাভেলিয়নের সামনে দিয়ে গোবিন্দ চলতে থাকে। দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। একের পর এক প্যাভেলিয়ন তার সামনে দিয়ে চলে যায়। তাঁতের কাপড় কিনুন, স্থানীয় শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করুন। গোবিন্দ ঢুকতে পারে না। কিছুটা কৌতুহল, কী এমন জিনিষ, এমন আয়োজন, এত উৎসব যার জন্যে।

কিছুটা ভয়, যদি না বুঝতে পারে। গোবিন্দের চোখের সামনে আঁকা বাঁকা কিছু রেখাচিত্রের মত ম্যাপ ঝুলে, উঁচুনীচু পাহাড় আর সমতলের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা লাইনের উপর রেল চলে, এবং গর্জনশীল বিরাট এক জলরাশিকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে কেউ মাইলের পর মাইল ধরে জলবিদ্যুত ছোটায়। অবশ্যই এ সব গোবিন্দ বুঝতে পারে না। ফলে ট্রাফিক পুলিশের মত কে যেন কেবলই সামনে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্কেত দেখায়। গোবিন্দ চলতেই থাকে এবং ঘুরতে ঘুরতে, যেহেতু কেবলই অনাবশ্যক মনে হয়, গোবিন্দ যখন ক্লান্ত প্রায়, তার চোখ ধানের রোয়াপোতা চৌকোনা একখণ্ড সবুজ জমিতে আটকে যায়।

গোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে। মেয়ের হাত তখনও তার হাতে শক্ত করে ধরা। এদিকটা প্রায় ফাঁকা। দু'একজন শুধু এদিক ওদিক, যেন উৎসব শেষের আলো জ্বলা, অথচ ফাঁকা বাড়ির মত, এমন। কিছুটা ভেতরে চেয়ারে একজন লোক বসে, লোকটি কি ঘুমুচ্ছে? গোবিন্দ ভেতরে ঢুকে। চৌকোনা সবুজ জমি এখন তার চোখে ঝুলে থাকে, ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, অথচ লোকটি উঠে আসে না। তাদের পায়ের শব্দে বোধ করি তার চটকা ভেঙ্গে যায়, অথচ সে উঠে আসে না। একবার শুধু তাদের দিকে চেয়ে তারপর আবার হাতের চেটোয় মাথা রেখে একটু পাশ ফিরে বসে। আর গোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকে। ভেতরের দেয়ালে মানচিত্র ঝোলে। কর্ষিত অকর্ষিত জমি, সমতল, টিলা জমি, সেচহীন, সেচ জমি, পাম্পসেট, গভীর, অগভীর নলকূপ। সার আর উন্নত ধরণের বীজের নমুনা। আর সর্বাধিক ফসলের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত, হাসি মুখ এক চাষী দম্পতির বিরাট ছবি ঝুলে। সে ছবি হাসি মুখে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক্রমে বিরাট, আরো বিরাট হয়, তার চোখে ঝুলে থাকা জমি খণ্ডকে ঢেকে দিয়ে যেন আরও বিরাট হতে হতে হঠাৎ এক প্রচণ্ড হাসিতে তা ফেটে পড়ে।

'ত্রিপুরা এক সময়ে গাছ-গাছড়ায় আচ্ছাদিত ছিল। সেই সময় ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ঐ সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ছিল বেশী। বন্যায় ফসলের ক্ষতি হত না বললেই চলে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে ও পাহাড় অঞ্চলে ব্যাপক হারে জুম চাষের ফলে এই বনাঞ্চল ক্রমশঃ বিলোপ হতে থাকে, ফলে বৃষ্টিপাতও কমতে থাকে ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষতি থেকে জমির ফসল রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন কৃষি কার্যসূচী

যথা থাক কেটে চাষ, ধাপে ধাপে বাঁধ নির্মান, লুঙ্গা ও জলা ভূমির উদ্ধার ও উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে।'

'মণ্ডল না' গোবিন্দ চকিতে ঘুরে দাঁড়ায়।

'হ' মণ্ডল অইত'

'মণ্ডল কি কইছ্‌ল ?"

'মণ্ডল কইছ্‌ল…'

'কি কইছল মণ্ডল ?'

'তুমার আমার লেইগ্যা !'

'মুর লেইগ্যা ? অই জমিন্‌ মুর লেইগ্যা ? তবে মণ্ডল হাসে ক্যান ?'

'আ মরণ, জমিন্‌ কইছে মণ্ডল ? অই রুসনাই।'

'অ-রুসনাই। কিন্তুক—জমিন্‌ না পাইলে মুই কি করুম ?

গোবিন্দ অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে, মালতী তার পেছনে। তীব্র বাঁক নেওয়া কোন গাড়ীর হেড্‌লাইটের আলো এসে পিছলে বেরিয়ে যায় তাদের শরীর থেকে আর মাইকের শব্দ আসে, আসুন, দেখুন, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য ··বাবলু, এদিকে চলে এস, মা বাবা তোমার জন্য···বয়স দশ···'দম মারো দম্‌·· পুতুল নাচ, আর হাসি, হাসি, চিৎকার নাগরদোলার দোলা শেষে—গেইল কি খতম হো গিয়া ? শব্দের তরঙ্গগুলি কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে, মায়াময় আলোতে পুকুরের জলে নৌকা বিহার হয়। আর রেখায়, চিত্রে, সংবাদে·

'দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সম্প্রসারিত করার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ শাখায় পরিণত হতে চলেছে কৃষি পদ্ধতি, অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, উন্নত জলসেচ প্রথা, রোগ পোকার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও উন্নতমানের চাষের যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমানে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এবং দেশের কৃষক ভাইগণও এর সুফল সম্পর্কে আজ উদাসীন নন।'

'আমাদের উদ্দেশ্য দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলা···দেশে খরা আছে, বন্যা আছে, এসবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমাদের দেশের কৃষক, যারা হাজার বছর ধরে···,

'ভূমি সংস্কার না করে, চাষীর হাতে জমি না দিয়ে···' চৌকোণা সবুজ জমি

গোবিন্দের চোখে ঝুলেই থাকে। শূন্যে কোন উদ্যানের মত। পরগাছার মত শিকড় ঝুলিয়ে। এখন এখানে যেখানে সভা করে উঁচু মঞ্চ থেকে বক্তৃতা হয়, গান হয়, আলো জ্বলে, গোবিন্দের জমি কেবলই শিকড় ঝুলিয়ে মঞ্চ থেকে মাটিতে নেমে আপ্রাণ রস টানতে চায়। মাটির রস, উর্বরা মাটির রস। আর মণ্ডল হাসে, গোছা গোছা ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে, পেছনে ঢেউ খেলানো যেন অন্তহীন শস্য প্রান্তর।

'মুই কি করুম? বাপডার বুহে ব্যাদ্‌না অইল, দসমাসের পোয়াতি বউ। মণ্ডলের আতে জমিন্‌ গ্যাল। বিডাঅ যায়।'

যেন দিতেই হবে এমন, গোবিন্দ কৈফিয়ৎ দেয়। আবেগহীন। এখন তার মেয়ের হাত ছাড়া। মালতী এখন মেয়ের হাত ধরে। আর গোবিন্দের দু'হাত ঝুলে। যেন দেহের সঙ্গে নয়, যেন প্রাণহীন। শুধুই যন্ত্রের মত, শুধুই জীবন ধারণ, অথচ শক্ত হাতে—লাঙ্গল ধরে, ট্রাক্টর চষা জমি, রোদ, বৃষ্টি, বারমাসই, কেননা যেহেতু উচ্চতর গবেষণায় বারমাসই ফসল সম্ভব, সনাতন মণ্ডলের ভাগচাষী অথবা মুনিষ, গোবিন্দ এখন এই মেলায়, মেলা ই, যখন বিদ্যুতের আলো চাঁদের মত মায়ামাথা মনে হয়, আলো-পিচ্ছিল পেশীবহুল জলের শরীরে নৌকা, মানুষেরা খেলে যায়, যখন চোখের উপর চৌকোণা সবুজ জমি বিস্তৃত হতে গিয়ে, লাল, নীল রোসনাইয়ের আলো জ্বলে শুধু, তার ঝুলে থাকা অথচ শক্ত দু'হাতের সঙ্গেই যেন পরম মমতায় কথা বলে। 'মণ্ডল কইল, গুবিন, তুমার জমিন তুমিঅই চাষ কর। কিন্তু মণ্ডলের কত খেত। কহন যে আমারডা মিল্যা গ্যাল কইতামঅ পারি না। অহন গুইর‍্যা গুইর‍্যা মণ্ডলের খেত চাষ করি। আর মুনিস খাডি মণ্ডলেরঅই বারিত, ফসল তুইল্যা মণ্ডলের গুডানে পাগাড় করি। আর মণ্ডল ফডু তুলে, ধানের গুছা মাথাত দিয়া মণ্ডল ফডু তুলে।

গোবিন্দ দাঁড়িয়েই থাক। সবুজ ধানের জমি কিছুতেই তার চোখ থেকে যেতে চায় না। অন্তহীন ঢেউ খেলানো ধানের জমি, আর রাশি রাশি সোনার ধান। ধান উড়ে হাওয়ায়, অথচ আলোর রোশনাই, লাল, নীল জ্বলে নেভে। তুমার আমার লেইগ্যা? গলানো সোনার মত গলে গলে ধান পড়ে, অথচ নৌকার শব্দ, জলের, মাইকের···আব তু আ যা, জীবনে তুমি না এলে এবং চিৎকার--খেইল কি খতম হো গিয়া? এদিক থেকে ওদিক বালির চূড়া গড়ে গোবিন্দ, ভেঙ্গে যায়, আবারও গড়তে চায়। গোবিন্দ দাঁড়িয়েই থাকে।

অথচ লোকটি উঠে আসে না। গভীর, অগভীর নলকূপ, পাম্পসেট, অথচ আসে না, শুধুই শূন্য প্রান্তর। সার, উন্নত সার আরও আধুনিক, উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ শুধুই পড়ে থাকে। খোপে, খোপে, দূরে দূরে, কখনই তারা মিলে না, কাছে আসে না। দেওয়ালে ম্যাপ ঝুলে। সেচহীন, সেচযোগ্য, সেচ জমি। কর্ষিত, অকর্ষিত জমি। অনুর্বর, উর্বর জমি। রাশি, রা—শি জমি। অথচ আসে না! কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, শিল্পে মন্দা। ধর্মঘট, লাগাতর ধর্মঘট। ভুখা মিছিল। লাঙ্গল যার, জমি তার। অথচ আসে না। গোবিন্দ দাঁড়িয়েই থাকে। আর মণ্ডলরা হাসে। ছবিতে হাসে। ছবি থেকে বেরিয়ে হাসে। কর্ষিত, অকর্ষিত, রাশি রাশি জমি জুড়ে সে হাসি বিস্তৃত হয়, বিস্তৃত হয়। আর শব্দ আসে, দক্ষিণ, পশ্চিম, পুব, উত্তর থেকে। রাস্তা থেকে শব্দ মাঠ থেকে শব্দ, মেলার শব্দ, আসুন দেখুন, চিড়িয়াখানা…আমাদের দেশে শতকরা সত্তর জন লোক দারিদ্র্যরেখার নীচে বাস করে… সুতার টানে পুতুল নাচে… শতকরা সত্তরজন লোক নিরক্ষর, তীক্ষ্ণ সুরে সিটি দেয় কেউ। চারজন, পাঁচজন, দশজন মিলে জটলা করে। ফাঁপানো বেলুন তুলে কার হাতে। আর নাগরদোলা ঘুরতে থাকে। ছুঁড়ে দেওয়া রিংয়ের ফাঁসে উঠে আসে এক বাক্স সাবান, টুপীর শূন্য গহ্বর থেকে বেরোয় এক ঝাঁক পায়রা। গ্র্যাজুয়েট বেকার যুবক দেওয়া রেস্তোরা থেকে বেরোয় তরুণ দম্পতি।

এবং লোক জমে, 'হাউজি' তাঁবুতে। আবেগহীন ঠাণ্ডা গলায় নম্বর ঘোষিত হয়। হাউজি জুয়া নয়—উচ্চকণ্ঠে কৈফিয়ৎ দেয় কেউ। একদল, দুদল করে বিষন্নতা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। ক্ষুধার জ্বালায় সন্তান বিক্রী। একদল, দুদল করে উত্তেজনা ঢুকে যায় ভেতরে। ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা। একজন, দু'জন করে বহুজন অপেক্ষা করে বাইরে। আর বাতাস ভারী হয়। ধূয়ায়, ঘামে, গন্ধে ভারী বাতাস ঝুলে থাকে।

গোবিন্দের হাত ধরে তার মেয়ে বলে, বাবা অতক্ষণ দাঁড়াইয়া কি দ্যাহ্খতাছ, মেলাত যাইবানা? শক্ত করে মেয়ের হাত ধরে গোবিন্দ বলে, চল মাইঅ— মেলাঅই দ্যাহি।

মেজাজ বিষয়ক ব্যক্তিগত

সম্প্রতি আমার মেজাজ খুব খিটখিটে হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে মনে করতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করতাম, কেননা এই মেজাজের দরুণ প্রায়ই এমন সব সিন্ ফিন্ ক্রিয়েট করে বসতাম যে পরে আবার নিজেরই লজ্জা করত, কেমন যেন অনুতাপও হত। কিন্তু তাহলে কী হবে, পরক্ষণেই হয়ত অন্য আরেকটা ছুঁতো (হ্যাঁ, ছুঁতো ছাড়া আর কী!) ধরে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠতাম।

আমার একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। স্বোপার্জিত নয়, পূর্ব পুরুষের। ঘড়িটা মাঝে মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, চাবি দিলে হয়ত ২/১ দিন ঠিক চলল, কিন্তু তারপরই আবার যে কে সেই। হঠাৎ একদিন মনে হল চাবিটা হয়ত ঠিকমত ঘোরানো হচ্ছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, সেদিন কিছুক্ষণ ঘোরানোর পর আর যখন চাবি ঘুরছে না, তখন এত জোরে চাপ দিলাম যে স্প্রিং ছিঁড়ে গিয়ে তিনি একেবারেই চুপ মেরে গেলেন। অবশ্য একদিকে মন্দ হয়নি। ঘড়িটা যখন চলত, টক্ টক্ শব্দটা মাঝে মধ্যে অসহ্য লাগত। হয়ত কোন একটা কাজ করে ফেলেছি, নিজেই ভাবছি ভাল হয়নি, তখনই ঐ টক্ টক্ শব্দটা কানে ঢুকে যেন টিকটিকির মত জানিয়ে দিত, ঠিক ঠিক —ভাল হয়নি, ভাল হয়নি। ভাবলাম, সেদিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে আর তিনি আসছে না। ঘড়িটা আর ঠিক করাইনি। এই ত হপ্তাখানেক আগেও আরেক কীর্তি করে বসেছিলাম। আমার ঘরের চা'ল খড়ের। বড ঘরটার কোণ থেকে একটা কুল গাছ চাল ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। তার ডালপালার বেশীর অংশটাই চা'লের উপর এসে পড়েছিল। গাছটায় তখন সবে ছোট ছোট কুল ধরেছে, মনে হল, এই ডালপালার জন্য ঘরের চাল' নষ্ট হচ্ছে—এগুলি কেটে ফেলা উচিত। দা'টা নিয়ে এগিয়ে যেতেই বৌ ছেলেকে পাঠাল

বারণ করতে, সবে কুল ধরেছে—ফলন্ত গাছ এভাবে কাটা উচিত নয়, কুল শেষ হয়ে গেলে কাটলেই চলবে। কিন্তু ঐ যে বললাম মেজাজ, তিড়িং করে সেটি লাফিয়ে উঠল, ফুলন্ত, ফলন্ত! ধাত্তোরি। এবং তৎক্ষণাৎই উঠে আমি সেটি কাটতে আরম্ভ করলাম।

আমার মেজাজ দেখে বৌ, ছেলে প্রায়ই অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকত। সামনাসামনি না হলেও আমি স্পষ্টতঃই বুঝতে পারতাম, তাদের চোখ মুখ আমাকে অনুসরণ করছে, আমার প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি তারা লক্ষ্য করছে। বস্তুতঃ আমার মেজাজ তাতে আরও চড়ে উঠত। বৌকে অবশ্য এতটা পাত্তা দিই না, অস্বস্তি বোধ করতাম ছেলেটার জন্য। বড় হয়ে আমার এখনকার কাজে সূত্র ধরে যদি আমাকে খোঁটা দেয়, বলে, হেঁ, দেখেছি ত, সামান্য একটা বিষয়েই তুমি কত মেজাজ খারাপ করতে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই উচ্চিংড়ের মত লাফানো মেজাজ কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে বেশ নরম হয়ে থাকে। আমার চেয়েও বেশী মেজাজ দেখানেওয়ালা বা আমার মেজাজকে থোরাই কেয়ার করে এমন কারোর কাছে কিন্তু আমি আশ্চর্য রকম নম্র। তাছাড়া যেখানে অভিভাবকত্ব করার অর্থাৎ নিজেকে বিন্দুমাত্র বিব্রত না করে অপরকে জ্ঞান দে'য়ার সুযোগ পাই, সেখানেও দেখছি কেমন বেশ ঠাণ্ডা গলায় আমি কথা বলতে পারি, বলতে পারি উত্তেজিত কাউকে—ছিঃ! মেজাজ খারাপ করতে নেই। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে ছাখো।

মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, আমার বেকায়দার সময়গুলিকে সামলে নে'য়ার জন্যই আমার এই মেজাজ দেখানো। হয়ত কোন কিছু সামাল দিতে পারছি না বা কোন কিছু মনঃপুত হচ্ছে না, অথচ কিছুই করার বা বলার নেই, এ অবস্থায়ই আস্তে আস্তে আমার মাথার ভেতর যেন বারুদ জমতে থাকে। বাড়ি ফিরে যদি কিছুমাত্র ছুঁতো খুঁজে পাই, সঙ্গে সঙ্গে সেই জমে থাকা বারুদে যেন আগুন লেগে যায়, মাথার ভেতরে তখন অসংখ্য বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে।

কিছুদিন ধরেই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম একটা কিছু করা দরকার। এভাবে বাইরে থেকে রাগ পুষে এনে বাড়ীর ভেতর লঙ্কাকাণ্ড বাঁধানো—এ চলতে পারে না, তাতে নিজের বাড়ীটাই ক্রমশঃ পুড়ছে

পুড়ছে নিজের দেহমন। ভেবে দেখলাম, দু'টো পথ খোলা আছে—হয় নিজের মরে যাওয়া, নয়ত সবকিছু শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করা।

আমি ভাবছিলাম। এমন সময় একটি ঘটনা, হাঁ ঘটনাই বটে, ঘটল।

আমি যে পাড়ায় থাকি, মূল শহর থেকে তা কিছুটা দূরে। গত কয়েক বছরে তার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটেছে। জায়গাটা প্রথম দিকে ছিল নীচু ধান জমি, এদিক ওদিক কয়েক ঘর রিক্সাওয়ালা এবং চাষী। শহরের লোকবসতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে ধানজমি ভরাট করে বসত ভিটার চাহিদা মিটাতে হয়। চাকুরে মধ্যবিত্ত, মাঝারি, ব্যবসায়ী, উকিল ডাক্তার, ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোক ক্রমে এদিকে আসতে থাকেন। কাঁচা ভিটা পাকা হয়। খড়ের ছাউনী সরে গিয়ে টিনের ছাউনী ওঠে। টিনের ছাউনী সরে গিয়ে পাকা ছাদও কিছু কিছু তৈরী হয়। চাষীরা আগেই উঠে গিয়েছিল। যে কয়েক ঘর রিক্সাওয়ালা ছিল, একজন বাদে তারাও উঠে যায়। যে একজন জায়গাটা কামড়ে পড়ে থাকে, সে নেপাল।

পাড়াটা যত উন্নত হয় মূল শহর তত এদিকে বিস্তৃত হয়। অথবা, এর উল্টোও বলা যায়, শহর যত এদিকে এগিয়ে আসে, পাড়াটা তত উন্নত হয়। লোক বসতি, দোকান পাট, বাজার, বাস, প্রাইভেট গাড়ি, স্কুটার, লরী সব মিলিয়ে এ অঞ্চল এখন বেশ জমজমাট। মূল শহরের সঙ্গে যুক্ত রাজপথ থেকে একটি চওড়া রাস্তা পাড়াটা ভেদ করে গেছে। তার দু'পাশে বাড়ীঘর। এই বাড়ীঘরের পেছনেও আবার বাড়ীঘর। ফলে, এই রাস্তাটি থেকে দু'দিকে আরও বহু সংখ্যক গলি চলে গেছে, আমি এখানকার পুরোনো বাসিন্দা, আমার বাড়ী বড় রাস্তার পাশে। আমার বাম পাশে বাড়ী করেছেন ডাক্তার নবীন সেন, ডান পাশে উকিল জলধর চৌধুরী। নেপালের বাড়ী ডাক্তারবাবুর বাড়ীর পেছনে। তার বাড়ীর বাকী তিনদিকে বাড়ী। ফলে তার বাড়ী থেকে বেরোতে হলে কারো না কারোর বাড়ীর উপর দিয়ে আসতে হয়। নেপাল এবং তার বাড়ীর লোকজন আমার বাড়ীর উপর দিয়ে আসে। ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে বিন্দুমাত্র বিশদৃশ্য মনে হয় না।

দিন কয়েক আগে বাজার করে ফিরছি, নবীনবাবু তার বাড়ীর বারান্দা

থেকে ডাকলেন, মাষ্টার মশাই কি ব্যস্ত নাকি ?

আসলে আমি মাষ্টার নই, কেরাণী। তবে উপরি আয়ের জন্য ২/১টা টিউশানি করি। কেমন করে নবীন সেনের ছোট ছেলেটিকেও (ক্লাশ সেভেনে পড়ে) পড়ানোর দায়িত্ব পেয়ে যাই। সেই থেকে তিনি আমাকে মাষ্টার মশাই বলে ডাকেন।

আমি কিছুটা বিস্মিত হলাম। কারণ, এ সময় তো আর বাড়ীতে থাকার কথা নয়। উনি কি অসুস্থ ?

বললাম, না, না ব্যস্ত নই। এ-ই বাজার করে ফিরছি। আপনি কি অসুস্থ। তিনি হাসলেন, না, এমনিই সকালটা ছুটি নিলাম।

রণজিৎকে পাঠিয়েছি চেম্বার খুলতে।

রণজিৎ তাঁর বড় ছেলে। সে-ও ডাক্তার। আপাততঃ বাপের সহকারী হিসেবে আছে। কিছু দিনের মধ্যেই বাইরে যাবে। নবীন বাবু লেন, বল একটা সুখবর শুনে যান। আপনার ছাত্র খুব ভাল পাশ করেছে। সত্যিই চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালেন বলা বাহুল্য, আমি খুব খুশী হলাম। তাঁর উজ্জ্বল চোখ, উদ্ভাসিত মুখ আমাকে অভিভূত করে দিল।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনি কিন্তু রেহাই পাচ্ছেন না। খোকার নতুন ক্লাশের জন্য আবার আপনাকে আসতে হবে। আর পারিশ্রমিকটাও কিন্তু এবার বেশী নিতে হবে।

আমি যত শুনছিলাম, ততই রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। সৌভাগ্যটা অভাবিত বৈকি ! দস্তুরমত চিন্তিত ছিলাম এ নিয়ে। কত অনায়াসে ডাক্তার সেন আমাকে ভারমুক্ত করে দিলেন।

স্বভাবতঃই এরপর আর টুক্ করে, 'আচ্ছা তবে আসি' বলে চলে আসা যায় না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি এবং নানা বিষয়ে আলাপ চলতে থাকে। নবীনবাবু দুঃখ করতে শুরু করলেন, বাড়ীটায় আর কুলোচ্ছে না বুঝলেন। আগে বুঝতে পারিনি, ফাউণ্ডেশানটা বড় জোর দোতলার হয়েছে। এখন না পারছি উপর দিকে বাড়াতে, না পারছি পাশে বা পেছনে বাড়াতে।

অন্যমনস্কের মত আমি রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম। চারদিকে ক্রমে ব্যস্ততা বেড়ে চলেছে। আমারও এক্ষুণি যাওয়া দরকার, নয়তো আপিসের দেরী হয়ে যাবে। অথচ আমি একপাও নড়তে পারছিলাম না। নবীন সেনের

ভিতর থেকে দুঃখ এসে আমাকেও দুঃখিত করে তুলছিল।

নবীনবাবু রেলিং-এর উপর ঝুঁকে পড়ে ফিস ফিসিয়ে বললেন, উকিল ব্যাটাতো আমার খাতিরে বাড়ী ছাড়বে না, আপনাকেও তো আর আমি বলতে পারিনা, সে আপনি বিনা পয়সায় ছেড়ে দিলেও এখন আপনার বাড়ি আমি নিচ্ছিনা। কিন্তু ভাবুন নেপাল—ও কোন্ সুখে এখনও এখানে পড়ে আছে বলুন তো ? আপনি রাস্তা না দিলে গতি নেই, তবু বলে, 'না, বাড়ি বেচুম না—!'

আমি চমকে উঠি। হ্যাঁ, ঠিকই তো ! এই তো চমৎকার সমাধান রয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে, নেপাল বাড়ি বেচতে রাজী নয়। আমি বুঝতে পারছিলাম ডাক্তার সেন আমার কাছ থেকে কিছু আশা করছেন, তিনি চাইছেন আমি কিছু বলি। আমি কী বলি ?

ডাক্তার সেন বললেন, আচ্ছা মাষ্টার মশাই আপনি যান, আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ী ফিরে আমি স্নান করে খেয়ে আপিস যাই। আপিস থেকে ফিরে ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যাই। তারপর বাড়ি ফিরে পড়াতে বসি। বৌয়ের সঙ্গে টুকিটাকি কথা বলি। কিন্তু আমি স্বস্তি পাই না। স্পষ্টতঃই বুঝতে পারছিলাম, আমার হাতেই রয়েছে চাবি কাঠি। আমি অস্থির হয়ে উঠি। এই তো আজ সকালেই ডাক্তার সেন কত অনায়াসেই না আমাকে ভার মুক্ত করে দিলেন, অথচ আমি কত ভাবছি তার একটা সমস্যা সমাধান করতে। আমার নেপালের উপর রাগ হচ্ছিল। অনায়াসেই সে বাড়ী বেচে দিতে পারে। ডাক্তার বাবুকে বলে কয়ে না হয় দরের চাইতে কিছু বেশী টাকা পাইয়ে দে'য়া যেতে পারে। সে কি ভাবছে আমি তার রাস্তা বন্ধ করে দিতে পারি না ? সত্য, আমাকে সে মাঝে মধ্যে বিনা পয়সায় লিফ্‌ট দেয়, কিন্তু তাই বলে যাবজ্জীবনের জন্য আমার বাড়ীর উপর দিয়ে তাকে রাস্তা দিতে হবে ? এ কেমন আবদার !

আমি স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলি এবং পরদিন নেপালকে ডাকিয়ে এনে জানিয়ে দেই তাকে আর আমার বাড়ীর উপর দিয়ে যেতে দে'য়া হবে না।

এখন আমার মেজাজ শান্ত। এখন আর চট্ করে আমি উত্তেজিত হইনা কেননা আমি জানি ডাক্তার সেন এখন থেকে আমার সহায় আছেন।

এত বেলায় মাছের বাজার জম জমাট থাকার কথা নয়। ছিলও না। ঢোকাব মুখে ষষ্ঠীচরণ প্রথমে শুধু মাছির উড়াউড়ি দেখে, আর দুটো ঘেয়ো কুত্তা। ছ'টা চাতালের প্রায় সবকটায় শুধু কাঠের বাক্স, ঝুড়ি আর ডালা ছড়ানো। মানুষজন চোখে পড়ে না, মাছ তো দূরের কথা। দিন পনেরো আগে ষষ্ঠী এখানে শেষ এসেছিল, বাড়ীর লাউ কুচো চিংড়ি দিয়ে খাবে বলে। তখন সকালবেলা, ইস্কুল, কাছারী, অফিস টাইমের বাজার, হাঁকডাকে সর গরম। আজ মাছ আনবে ভাবতে—বাজারে ঢোকার আগে ষষ্ঠীর চোখে সেই বাজারের গমগমে চেহারাটা ভাসছিল।

আইয়েন কর্ত্তা, বালা মাছ আছে। ষষ্ঠী দেখে তার বা হাতি দক্ষিণের চাতালটার শেষ মাথায় একটা লোক বসে। উত্তর দক্ষিণে ছড়ানো ঘরটার পুবদিকের মাঝ পথদিয়ে ঢুকেছে বলে প্রথমে দেখেনি। লোকটার সামনের ডালায় কিছু মাছ, সঙ্গে চাতালটায় চার জন তাস খেলছে। ষষ্ঠীর পরনে ঢোলা খাকি হাফপ্যাণ্ট, হাফসার্ট, গামছাটা কাঁধে। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; রোগা লম্বা ঘাড়ের উপর বড় কষ্টে চেপে বসা মস্ত মাথা। চুল ছোট এবং সাদা, দাঁড়িগোঁফ নেই, চাষা থেকে ষষ্ঠী রিক্সাওয়ালা হয়েছে বছর দুয়েক আগে। কর্ত্তা ডাকে সে চটে যায়, তবে রাগ চেপে বলে,

মাছত বালা, দামডা বালা নি ?

ঝাঁকরা চুল, গলায় কণ্ঠী, মাছঅলা বলে কিতা যে কন কর্ত্তা, এর থেইক্যা হস্তায় পাইতেন না। বেলা অইয়া গ্যাছে গা দিথ্যা ছাইরা দিতাছি।

এঁ, বলে ষষ্ঠী মাছের গায়ে আঙুল টিপে, কাতলার বাচ্চা, শ'চারেকের কম হবে ওজন। আঙুল সরিয়ে নিলেও একটু খানিক যেন টোল খেয়েই থাকে জায়গাটা। হরদম মাছি উড়ছিল, হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কণ্ঠিধারী বলে, আরে ছাহেন কি, মাছডা কি পইচ্যা গ্যাছে গা ?

মাছ গতরাতের—দেখেই বোঝা যায়, সকালেও তা বিকোতে পারেনি, ঝাঁকা চুপ কনট্রাক্ট নিয়েছে বিকোতে পারলে ফিফটি পারসেন্ট তার।

ষষ্ঠী খুব মনোযোগের সঙ্গে মাছটা লক্ষ্য করতে থাকে। পাশে বৈচি মেশাল কিছু কুচো চিংড়ি। কিন্তু নিতে হবে বড় মাছ। জামাই আসবে রাতে মেয়ে নিয়ে, এই দ্বিতীয় বার আসা। মেয়ের মার আবদার, একটু আধটু গাঁইগুঁই করলেও সে রাজী হয়ে যায়। উষা প্রথম সন্তান আর একমাত্র মেয়ে বলে। রাতেও মাছ নিতে পারত, সকালের মত রাতের বাজারও বেশ জমে কিন্তু সন্ধ্যার মুখে একটা টিপ আছে, নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা, কত দেরী হয় কে জানে। তাছাড়া জম জমাট বাজার আর ভাঙ্গা বাজারের মধ্যে দামের তফাৎ হয় বৈকি!

ছাউনির তলায় থেকেও রোদের তেজী ভাব টের পাওয়া যায়। শেষ রাতে ঠাণ্ডা পড়ে, অল্প স্বল্প কুয়াশায় চাদর মোড়া ঠাণ্ডা। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ দেখে কে! আশ পাশের আনাজ পত্রের দোকানে কিছু কিছু খুচরা খদ্দের। কিছুটা দূরে চায়ের দোকানটার কোল ঘেঁষে আরো একটা তাসের আড্ডা, মাঝে মধ্যে হঠাৎ বাতাসে চায়ের দোকান থেকে ধোঁয়া ঝাপটা খেয়ে এদিকে উড়ে আসছে। ষষ্ঠীর বা হাতি বটগাছটার তলায় এক বুড়ো ভারী বেজার মুখে সাদা কাপড় মোড়া আরেক বুড়োর মাথায় কাঁচি চালাচ্ছে। ষষ্ঠীর পেছনে তাস সাফ্‌ল করার শব্দ হয়, তীক্ষ্ণ সুরে একজন চেঁচিয়ে উঠে, ডাকডা ফিরাইয়া দিলেন না ক্যান, আর একজন উত্তর দেয়, ফিরামু ক্যামনে হরতন ছারা আছ্‌লডা কি! ষষ্ঠী ভাবে মাছটা সবে নরম হতে আরম্ভ করেছে, বাড়ী নিয়ে এখনি রান্না করে ফেললে ততটা খারাপ হবে না!

ষষ্ঠীর ইতঃস্তত ভাব দেখে কণ্ঠীধারী সাহস জোগায়, অত ভাবেন কিতা, ইটু্‌ স্যাতাইয়া পরছে এ না, গরম দেহখ্‌ছেন নি, মাছত মাছ মানুষ হদ্দা স্যাতইয়া পরে; লইয়া যান হস্তায় দিমু।

—কিলু কত কইর‍্যা?

পাল্লায় বাটখারা চাপাতে মাছওয়ালা বলে, আট আর চাইতাম না, সাতঅই দিয়েন।

পাঁচ না ছয় পাঁচ না ছয়, ভাবতে ষষ্ঠী বলে পাঁচ কইর‍্যা দিমু।

মাছের দিকে বাড়ান হাতটা গুটিয়ে নিয়ে মাছঅলা বলে না গোঁসাই, অইত

না। একটা নেড়ো কুত্তা ষষ্ঠীর পা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, সরে গিয়ে সে মাছঅলার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকায় তারপর মুখ তুলে উদাস স্বরে বলে, দ্যাহেন, পাঁচ অইলে দিয়া দ্যান।

মাছঅলা বলল, আয়ো, অত মুলাইয়েন না, অত ফ্যালনা ভাবতাছেন ক্যান, স্থান আপনের আউস অইছে, কিলু টিলু না, থাউকা, দুই ট্যাহা দিয়া দেন।

ষষ্ঠী আউসের মাছ নিয়েই নেয়। দর কষাকষি তার বেশীক্ষণ পোষায় না। রিক্সা ভাড়ায়ও তাই পাঁচ দশ পয়সা কম পায় হামেশা। মনটা অবশ্য কিছুক্ষণ খিঁচিয়ে থাকে। কিন্তু সবাই সবকিছু পারেনা ষষ্ঠী জানে। কটুকরা রশি কুড়িয়ে নিয়ে মাছটার কানকোর ভিতর দিগে গলিয়ে এনে মাছঅলা শক্ত করে বেঁধে দেয়।

পুব বাজারে রিক্সা রাখা ছিল। বাহাতে মাছ ঝুলিয়ে রিক্সাটার কাছে এসে দাঁড়াতে ষষ্ঠী দেখে উত্তর দিকের ঝুপড়িটা থেকে বেরিয়ে আসছে শ্যামবাবু। শ্যামবাবুর দিন রাত্রির ভেদ নাই। রাতে যেমন, দুপুরেও তেমনি বাড়ী যাবার মুখে তিনি এক গেলাস দেশী চড়িয়ে যান। তবে বেচাল হন না কখনই। মাঝে মাঝে ষষ্ঠী রাত্রে শ্যামবাবুকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। আজ যেন একটু তাড়াতাড়ি ফিরছেন। ষষ্ঠীকে দেখে শ্যামবাবু হাত তুলে ইশারা করেন। হাতে মাছ ঝুলিয়ে ষষ্ঠী চিন্তা করে, শ্যামবাবুকে না করে দেবে কিনা। তারপর ভাবে বাড়ী যাবার পথে একটুখানিক ঘুরে গেলেই শ্যামবাবুকে পৌঁছে দেয়া যাবে। তাছাড়া আর একটাও খালি রিক্সা নেই আশে পাশে। মাছটা রিক্সার পাটাতনে ফেলে সে রিক্সা নিয়ে এগিয়ে যায় শ্যামবাবুর দিকে। এক ঝলক বাতাস কয়েকটা কাগজের টুকরা আর একমুঠো ধুলা নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সাইকেলে রিক্সায়, হেঁটে মানুষ আসছে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে তেরপল ঢাকা মাল বোঝাই ভারী ট্রাক, জীপ, ট্যাক্সি। ষষ্ঠী ভাবে একটা বড় কাগজ পেলে হত, মাছটা ঢেকে রাখা যেত। কাঁধের গামছাটা দিয়ে মোড়া যায়। কিন্তু গামছা ছাড়া তার এক মুহূর্তেও চলে না, মাঝে মাঝেই মুখটা মুছে নিতে হয় তাকে, এমন কি রিক্সা চালাতে চালাতেও।

শ্যামবাবু রিক্সায় উঠে বসেন। মাছের দিকে নজর পড়েছে তার। পায়ের উপর পা তুলে তিনি বসেন মাছ নিয়ে একটি কথাও বলেন না।

ষষ্ঠী বলে, আজগা যেমন তাড়াতাড়ি যাইতাছেন গা বাবু, কডা বাজে?

শ্যামবাবু বলেন; সাড়ে এগারটা। হু, বাসায় একটু কাজ আছে।

প্যাডেলে পা দিতে দিতে ষষ্ঠী আবারও ভাবে মাছটাকে কিছু দিয়ে ঢেকে নিলে হত, একবার ভাবে শ্যাগুলেই ঝুলিয়ে নেবে কিনা, তারপর তার মনে হয়, শ্যামবাবুর বাড়ী এমন কিছু ঘুরতি নয়, বাড়ী পৌঁছতে সবশুদ্ধ আধঘণ্টাও লাগবে না। ষষ্ঠী জোরে জোরে প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে। শ্যামবাবুকে নামিয়ে দিয়ে ষষ্ঠী রিক্সা টেনে নিয়ে সামনে এগোয়। শ্যামবাবু একটা আধুলী দিয়েছেন। কয়েক গজ পরেই বা পাশে একটা গলি। গলির শেষমাথা তার পাড়ার রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। খুব সুগম না হলেও বেশ সর্টকাট মারা যায় প্রয়োজনে। গলির মাঝামাঝি হাত তিনেক চওড়া আধ হাত গভীর খালের মত। রিক্সা পার করতে কষ্ট হবে। তা হোক। অনেকটা সময় বাঁচবে তার। রোদ এখন বেশ কড়া। গামছায় কয়েক দফা মুছে নিলেও বিন বিন করে ঘাম জমতেই থাকে চুলের গোড়ায় গোড়ায়, ঘাড়ে, কপালে, সমস্ত শরীরে। গলি পথে নামতে যাবে, ষষ্ঠী ডাক শুনতে পায়, অ্যাই রিক্সা, দাঁড়াও।

সে দাঁড়িয়ে পড়ে অনেকটা অভ্যাস বসে। মোড়ের মাথার বাড়ীটার গেটে একটা যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটি বিবাহিতা।

ষষ্ঠী মুখ ঘুরিয়ে বলে, যাইতাম না।

ততক্ষণে একটি যুবক এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির পাশে, বলে, যাইবা না ক্যান্?

মুহূর্তে মাথায় রক্ত উঠে যাবার মত হলেও ষষ্ঠি তার দিক চেয়ে বিনীত গলায় বলে কাম আছে বাবু।

মেয়েটি বলল, চলুন না একটু কষ্ট করে, বেশী দূর নয়, মটরষ্ট্যাণ্ড যাব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। একটাও রিক্সা পাচ্ছি না। বাসেরও সময় হয়ে গেছে।

ষষ্ঠী কী বলবে ভেবে পায় না। মটরষ্ট্যাণ্ড যেতে হলে আবার তাকে আগের পথেই ফিরে যেতে হবে। সেখান থেকে বাড়ী ফিরতে সব মিলিয়ে প্রায় একঘণ্টা লেগে যাবে। এবং এসব ভাবতেই তার সমস্ত শরীর মন বেঁকে বসতে চায়। সে মাছটার দিকে চায়, তার মনে হয় মাছটার পেট যেন ক্রমশঃ ফুলে উঠছে, এবং একটা মৃদু পচা গন্ধের ঝাপটা যেন এসে লাগছে তার নাকে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বাপের বাড়ী যাচ্ছে, ষষ্ঠী ঠিক বুঝতে পারে

না মেয়েটি বা তার স্বামী মাছটি দেখেছে কি না বা কোন গন্ধ পেয়েছে কিনা।

বস্তুতঃ এড়ানো উচিত, অথচ এড়ানো যায় না এমন এক সমস্যার সামনে ষষ্ঠী বিমূঢ় হয়ে পড়ে। একবার ভাবে মাছটা নিয়ে এখনি তার বাড়ী যাওয়া উচিত, তারপর মনে হয়, এমন আর কী দেরী হবে। তাছাড়া, টাকা খানেক তো পাওয়া যাবে। সকাল থেকে তিনটির বেশী ট্রিপ পায় নি সে, এখন পর্যন্ত রোজগারে মাছটার দামও উঠে আসে নি তার। তবুও তার মনে হয় বাড়ী যেতে হবে এবং তা এখনি, আর দেরী করলে মাছটা একেবারেই পচে যাবে।

গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে বলে, একডা মাছ আছে রিক্সায়, আপনারই বইতে কষ্ট হইব।

মেয়েটি বলল, না পচা গন্ধ তো বেরোচ্ছে না। তারপর ষষ্ঠীর দিকে চেয়ে বলল, আমাদের কিছু অসুবিধা হবে না, কাগজ এনে দিচ্ছি, মাছটা জড়িয়ে একপাশে রেখে দিলেই হবে।

এ কথায় ষষ্ঠী স্পষ্টতই আরো বিব্রত হয়। এবং কী করবে ঠিক করতে না পেরে ক্রমশঃ রেগে উঠে। মেয়েটি একটা খবরের কাগজ নিয়ে এলে চাঁছা ছোলা গলায় সে বলে, আইক্কা উডেন, আর ট্যাহা লাগব।

যুবকটি আঁতকে উঠে, আর টাহা? কইতাছ কি তুমি? স্বপ্ন পাইছ বুঝি।

ষষ্ঠী বলল, এর কমে পারতাম না বাবু! মেয়েটি স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, আহা তুমি থামতো। তারপর কাগজটা ষষ্ঠীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, চলুন।

যাত্রী দুজন উঠে এসে হুড তুলে দিলে রিক্সা ঘুরিয়ে ষষ্ঠী প্রানপনে প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তার মনে হয়, চাকা যেন ঘুরছেই না। মনে হয়, অনেক অনেক সময় লেগে যাবে তার বাড়ী ফিরে যেতে। তার রাগ হতে থাকে, কেন সে 'না' বলে চলে যেতে পারল না, তার রাগ হতে থাকে মাছ অলা শ্যামবাবু, যুবক যুবতীর উপর এবং তারপর ক্রমশঃ রোদ, মেয়ে মেয়ের জামাই এবং ভাগ্যবতীর উপর। এক অসহায়তা, করনীয় যা তা না করতে পারার অক্ষমতা ক্রমশঃই রোদে ঘামে বিপর্যস্ত ষষ্ঠী চরণের ভেতর আরো জ্বালা ধরাতে থাকে।

ডানে, বায়ে, একের পর এক মোড় ঘুরতে ঘুরতে ষষ্ঠি একসময় পূব বাজারের যেখানে তার রিক্সাটা মাছ কেনার সময় রাখা ছিল সেখানে পৌঁছে যায়। রাস্তায় এখন লোক চলাচল কমে গেছে, ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো বাসটা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ যুবকটি চেঁচিয়ে উঠে, আরে, আরে বাসটা যে ছাইরা দিল। স্পষ্টতঃই বাসটার ইঞ্জিন চালু করার এবং হর্ণ দেবার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু তখনও তা জায়গা থেকে নড়ে নি, হয়তো আরো তাড়াতাড়ি গেলে তা ধরা যেতে পারে। একট যান্ত্রিক অভ্যাসে এবং একই সঙ্গে তার ভিতর থেকে জাত অথচ তার বোধের অতীত এক কর্তব্য বোধ, এক গভীরতর অনুভূতির তাড়নায় ষষ্ঠী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে. তার মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, দুহাতে হ্যাণ্ডেল শক্ত করে ধরে সে প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে। পেছনে গাড়ীর শব্দ, সাইকেল, রিক্সা, লোকজনের আনাগোনা কিছুই যেন সে শুনে না বা তার নজরে পড়েনা। কপাল, গাল বেয়ে ঘাম ঝরে, একমুখী একাগ্রতায় যে বাস এখনি ছেড়ে যাবে, সে বাস ধরার আশায় সে ছুটে চলতে থাকে।

বাস তখনও ছাড়ে নি। ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছিল বার বার। যেন প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের সংকেত দেবার মত পর্যায়ক্রমে সে হর্ণ দিয়ে যাচ্ছিল। টিকিট ঘর, এবং আশ পাশের হোটেল, চা মিষ্টির দোকান থেকে দু'একজন করে যাত্রী দ্রুত বেরিয়ে এসে বাসে উঠে যাচ্ছিল। ষষ্ঠী থর থর করে কাঁপতে থাকা গাড়ীটার পেছনে এসে রিক্সা দাঁড় করায়। আর সামনে যাবার তার ইচ্ছে ছিল না, উপায়ও ছিল না। রাস্তার অনেকটা ধার ঘেঁষে বাসটা দাঁড়িয়েছিল।

রিক্সাটা থামতেই যুবকযুবতী দুজন নেমে পড়ে। কাঁধ থেকে গামছাটা নামিয়ে ষষ্ঠী মুখ মুছবারও ফুরসত পায় না। যুবকটি ভাড়া এগিয়ে দেয়, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে অনুসরণ করে। ষষ্ঠির আশঙ্কা ছিল হয়ত ভাড়া নিয়ে খিটিমিটি বাধবে। কেননা আসলেই সে ভাড়া বেশী চেয়েছিল, কিন্তু সে সব কিছুই না ঘটায় সে খুশী হয় এবং এখন তার অবকাশের মুহূর্তে রোদ, তার তাড়া ইত্যাদি কারণগুলোক বেশী ভাড়া চাওয়ার সপক্ষে একে একে দাঁড় করায়।

সে সিট থেকে নেমে পড়ে, রিক্সাটা ঘুরিয়ে নিতে হবে। আরো কয়েকটা রিক্সা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, এত অল্প পরিসরে সিটে বসে রিক্সা

ঘুরানো যাবে না। তার এখন নিজেকে বেশ হাল্‌কা লাগছিল। মাছটি পচে গেছে কিনা, এ নিয়ে আর সে ভাবছিল না, শুধু মনে হতে থাকল, এবার সে মাছটি নিয়ে বাড়ী যেতে পারবে। আশ পাশের রিক্সাগুলো একে একে যাত্রীভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছিল। ষষ্ঠি খুব ধীরে সুস্থে গামছা দিয়ে মুখ, ঘাড় গলা মুছে নেয়। রিক্সার ঝাঁকুনিতে অথবা যাত্রী দুজনের নামার ব্যস্ততায় পায়ের ধাক্কা লেগে মছটা পাটাতনের শেষ প্রান্তে সরে গেছল, পড়ে যেতে পারে আশঙ্কায় সে মাছটাকে আবার আগেকার জায়গায় সরিয়ে রাখে, তারপর রিক্সা ঘুরানোর জন্য হ্যাণ্ডেলে হাত রাখে। আর তখনই যেন মাটি ফুঁড়ে এসে একটি মাঝ বয়সী লোক হুড়মুড় করে তার রিক্সায় উঠেপড়ে বলে, অ্যাই তারাতারি চল, ডি, এম অফিস ।

লোকটি অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, যেন কাউকে খুঁজছে, তার সমস্ত শরীরে অস্থিরতা ফুটে বেরোচ্ছিল। ষষ্ঠি কয়েক মুহূর্তে লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। গর্জন করে কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসটি বেরিয়ে যায় ষ্ট্যাণ্ড থেকে। ডান হাত হ্যাণ্ডেল থেকে সরিয়ে কাঁধ থেকে গামছা এনে সে আবারো মুখ মুছে; এবং মাছটাকে দেখে। তারপর বলে, ভারা কিন্তুক বেশী লাগব, দুই টাকা।

একটি বন্ধুত্বের ইতিহাস

বাসে উঠতেই মহীতোষ বন্ধুর দেখা পায়। —আরে নবনী, শালা থাকিস কোথায় রে? নবনী হাসে, চোখে কালো চশমা, গায়ে হাওয়াই শার্ট, নবনী এখন একটু পাশ ফিরে বসেছে।

সত্যি কদ্দিন পরে দেখা হলো বল্‌তো? আমি ভাবছি বুঝি বদলীই হয়ে গেছিস্। মহীতোষ একটানা খুশীর উচ্ছ্বাসে কথা বলে চলে; এক হাতে রড ধরে ভারসাম্য রক্ষা করছিল সে। তার এবং নবনীর মাঝখানে আর একটি লোক এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে মহীতোষকে একটু ঝুঁকে, গলা বাড়িয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। মহীতোষ মিনতি করে লোকটিকে বলল, দাদা কাইণ্ডলি একটু এ পাশটায় আসবেন? বুঝতেই পারছেন বহুদিন বাদে শালার সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক মুচকি হেসে সরে যেতে মহীতোষ তার ডানহাত নবনীর কাঁধে রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

—হ্যাঁরে নবনী, সত্যি এদ্দিন কোথায় ছিলি বল্‌তো?

—কেন এইখানেই তো। বাপু হে, সংসার চক্রের আবর্তনে একই ছাদের তলায় অধিষ্ঠিত সহোদর ভ্রাতার সন্দর্শন পর্যন্ত আজ সাতদিন ধরে পাইনে, আর তুমি তো শালা বেপাড়ার লোক।

—অথচ কয়েক বছর আগের কথা ভেবে ছাখ। মনে আছে, ঝড়ে একদিন তোর বাড়ীতে যেতে পারিনি বলে, পরদিন ভোর চারটেয় গিয়ে তোর ঘরের কড়া নেড়েছিলুম।

—মনে নেই আবার? কী রকম রেগে গেছলাম।

—সে তো বাইরে। আসলে খুব খুশী হয়েছিলি, আর তাইতো গরম গরম জিলিপী খাইয়েছিলি। দু'জনে হেসে উঠে। তারপর মহীতোষ বলে এখন যেন কি রকম হয়ে গেছি না?

মহীতোষ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। নবনীও। বাসে ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে। অসম্ভব গরমে গুমোট আবহাওয়ায় সমস্ত শরীর ঘামে জ্যাবজ্যাব করছে।

অথচ এতক্ষণ যেন ওরা তা টের পায় নি ! অতীতের সুখকর স্মৃতির মায়ায় ভীড় নেই, ঘাম নেই, ক্লান্তি, অবসাদ কিছু নেই, এমনি এক কল্পলোক তৈরী হয়ে গেছল তাদের মধ্যে। নবনী, মহীতোষ দুজনেই কেমন অস্পষ্ট-ভাবে তা অনুভব করে।

মহীতোষ বলল, দিপুর খবর জানিস ?

—শুনলাম, বিয়ে করেছে। ওর ছোট ভাই বলছিল সেদিন।

—আশ্চর্য আমাদের একটা চিঠি দিয়ে পর্যন্ত জানায় নি।

—ও তো রাঁচী না কোথায় আছে।

—রাঁচীতেই। আরে শালা জানালে কী আর আমরা গিয়ে তোর বাড়তে হামলা করতাম ? না বিয়ে ভাংচি দিতাম। জঘন্য, জঘন্য। তীব্র ঘৃণায় মহীতোষ নাক কুঁচকায়।

নবনীর পাশের লোকটি এ সময় উঠে পড়লে নবনী সরে গিয়ে মহীতোষকে জায়গা করে দেয়। মহীতোষ বসে পড়ে প্রচণ্ড হাঁফ ছাড়ে তারপর রুমাল বের করে কপাল, ঘাড় মুছতে মুছতে বলল যাকগে ও ছেড়ে দে. তারপর বউ নিয়ে পুরী বেড়াতে গেছলি না ! কেমন কাটল রে ?

ওফ্। মার্ভেলাস, সত্যিই ভাল লেগেছে, সমুদ্রে স্নান, সমুদ্র পারে বেড়ানো, রাত্তিরে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের গান শোনা,—নবনী গলায় কবিত্বের ছোঁয়া লাগায়। ও! অপূর্ব। —বিশেষত: সঙ্গে একেবারে টাটকা বিয়ে-করা বউ থাকলে আরও জমে, নারে! মহীতোষ চোখের কোনায় ঝিলিক মেরে হাসতে থাকে। নবনীও হাসে। নারে, সত্যিই সমুদ্রের ধারে গেলে না কেমন একটা মহান ভাব এসে যায় মনে।

মহীতোষ হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে উঠে, আরে আরে ব্যস্, ব্যস্, আবার ওসব মহান টহান আমদানী কেন বাপু ?

চড়া গলায় এক উত্তেজিত বাক্যালাপে তারা দুজনেই সামনে তাকায়। একটি যুবক এক প্রায় প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বলছে, এত আয়েসী হলে ট্যাক্সী চাপুন গে দাদা। বাসে উঠেছেন কেন ? ভদ্রলোক মুখিয়ে উঠেন, সেকি আপনাকে জিজ্ঞেস করে উঠব নাকি ! কণ্ডাক্টর মিনতি করে বলে থামুন না, দাদা ভীড় দেখছেন না, একটু আধটু লাগবেই। নবনী মুখ মুচকে বলল, এই এক নিত্য দিনের ঝামেলা, মানুষগুলি যেন সব তেতে পুড়ে আছে। পান থেকে চুন খসলেই হলো। থাকগে তোর মিলের খবর কিরে ? কাগজে

যেন কি দেখলাম সেদিন।

আর বলিস না। মালিক-গুলা শালা খচ্চর মাইরি। সারাটা বছর তার মুনাফা বাড়িয়ে এলুম, আর বোনাস চাইতেই, হ্যানো, ত্যানো, সাত সতেরোর ধাক্কা।

বোনাস দিয়েছে তো ?

এখনও টানা পোড়েন চলছে। না দিয়ে যাবে কোথায়, তবে খা তেতে আছে না, সুযোগ পেলেই কঁ্যাক্, কবে যে শালা ছাঁটাই হয়ে যাব।

নবনী জানালার বাইরে তাকিয়েছিল। বাস প্রায় শহরের কেন্দ্রস্থলে এসে পড়েছে। লোকের ভীড় বাড়ছে। ব্যস্ততা, আর ধোঁয়া ধুলো দেখতে দেখতে এক সময় সে উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় এলাম রে ? মহীতোষ বলল।

— মিউজিয়াম এসে গেছে।

—তুই কোথায় যাবি ?

—আমি এখানেই নাবব ?

চল, আমিও নাবব এখানে।

বাস থেকে নেমে মহীতোষ বলল, তোর কি তাড়া আছে, নবনী চল চা খাই।

নবনী বলল, না দেরী হয়ে যাবে।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস্ বললি না ?

—এই তো সামনেই।

—চেপে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে।

—আরে না না চাপব কেন ? বউয়ের সখ হয়েছে, সিনেমা দেখবে। তাই…

চলতে চলতে মহীতোষ বলল, আচ্ছারে নবনী, দশটা টাকা নিয়েছিলি মনে আছে, মাস তিনেক আগে ?

—হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

—দিয়ে দে'না, একটু রিলিফ পাই, তা'লে। সন্তুটা জ্বরে পড়ে আছে কাল থেকে।

—দেব, দেব, এই সামনের মাসেই দিয়ে দেব।

—আর দিবি। তিন মাস হয়ে গেল, এখনও বলছিস সামনের মাসে।

নবনী থেমে দাঁড়িয়ে বলল, তুই কি আমাকে বিশ্বাস করিস না।

—বিশ্বাস, অবিশ্বাসের কথা নয়। বউ নিয়ে পুরী বেড়িয়ে এলি, আজ আবার সিনেমা দেখাচ্ছিস, তারপর আবার রেষ্টুরেন্টে বসে, কোর্মা মাংস, চপ, কাটলেট, ········অথচ দেনার দশটা টাকা দিতে পারিস না।

মহীতোষ এখন তার প্রতিটি ইচ্ছা, আকাঙ্খার অপূর্ণতার জন্য নবনীকে দায়ী মনে করছিল। নবনীকে তার কৃতঘ্ন এবং প্রতারক মনে হচ্ছিল। টাকার জন্যই সংসারের অনেকগুলি ফাঁক সে পূরণ করতে পারে নি। এখনও পারছে না।

প্রায় দয়া জাগানো করুণ কণ্ঠে সে বলে।

—পাঁচ পাঁচ করেও তো দিতে পারিস।

বললাম তো রে বাবা দেব, একবারেই দিয়ে দেব। চাস্ তো সুদও দেব। যেমন কাবুলী-ওয়ালা হয়ে গেছিস্।

অপমানে মহীতোষের মুখ কালো দেখায়। মুহূর্তে তার মন হিংস্র হয়ে উঠে। প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, পরের পয়সায় পোদ্দারী করতে খুব ভাল লাগে, না! কেন বউকে বলতে পারিস্ না, চল আমরা সৎ হয়ে যাই। পুরী যাব না, অথবা খরচ কমিয়ে ফেলি, সিনেমায় না গিয়ে মহীর টাকাটা শোধ করে দিই। বলতে লজ্জা করে?

মুখ ফিরিয়ে নবনী বলে, যা যা তোর সঙ্গে কথা বলা যায় না, দেব না তোর টাকা। দিয়েছিলি তার প্রমাণ আছে?

কি? আমি মিথ্যে বলছি? চড়াৎ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলে মহীতোষ আচমকা লাফ দিয়ে নবনীর বুকের কাছে জামা খাম্চে ধরে। শালা চোর, রাস্কেল ইয়ার্কী মারার জায়গা পাও নি। মহীতোষের চোখ দুটি জ্বলতে থাকে, যেন! বুকভরা তার বিকৃত মুখ থেকে যেন আগুনের হল্কা ছিটিয়ে পড়তে থাকে চারদিকে।

হঠাৎ আক্রমণে নবনী হতভম্ব হয়ে যায়। ইস; মারবি নাকি? ভয়ে, অস্থিরতায়, তার চোখ দুটি কেমন গোল গোল হয়ে গিয়ে সমস্ত মুখখানা, এক কুৎসিৎ আকার ধারণ করে। আর মুহূর্তে মহীতোষ ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে যায়। হাতের মুঠো থেকে জামাটা ছেড়ে দিয়ে এক আহত রক্তাক্ত পশুর মত পা টেনে টেনে গোডাউনের মুখো চলতে থাকে।

শহর গ্রামের বুক জুড়ে তখন সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহ।

মাঠ ভেঙে ট্রামরাস্তায় যেতে যেতে বিনয় মনুমেণ্টের তলায় ভীড় দেখল। প্রথমে কোন রাজনৈতিক দলের সভা ভেবে পরে সন্দেহ জাগল। কেননা সভা হলে তেমনভাবে অল্প জায়গায় গোল হয়ে লোক জমায়েত হতনা এবং বক্তৃতা যারা দেয়, সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়েই দেয়। সিঁড়ির উপরে চানাচুর এবং বাদামভাজা নিয়ে কয়েকটা লোক দাঁড়িয়ে এবং বসে ছিল। অতএব ওর সন্দেহ বদ্ধমূল হল। কোন বিখ্যাত মলম অথবা পাচনরস বিক্রেতা বা কোন ম্যাজিক অথবা অন্য কোন খেলা দেখনেওয়ালার আসর বলেই ওর নিশ্চিত ধারণা হল। এবং এ ধারণা নিয়েই ও এগোল। কিছুটা দূরে ট্রাম-রাস্তায় ট্রামগুলো আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে অনবরত আসা যাওয়া করছিল। চারপাশে মাঠময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিঃসঙ্গ অথবা সসঙ্গী মানুষের ভীড় এবং তার সঙ্গে ভুট্টা পোড়ানোর গন্ধে ওর মস্তিষ্কে যুগপৎ বিরক্তি এবং ক্ষুধার তীব্র অনুভূতির সঞ্চার হচ্ছিল। পকেটে হাত দিয়ে যে পয়সা বেরোল, ট্রামের ভাড়া রেখে দিয়ে কিছু থাকল না। অথচ পেটে ক্ষুধা ছিল। সময় খরচ এবং পয়সা বাঁচানোর তাগিদে বিনয় নিজেকে ভীড়ের মধ্যে মিশিয়ে দিল।

একটা খেলা শেষ হয়ে নতুন খেলা আরম্ভ হবার মধ্যবর্তী সময় ছিল ওটা। তিনটি বানর এবং দুটো সরু লাঠি নিয়ে লোকটা মাটিতে উবু হয়ে বসে ছিল। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, মুখময় চাপ দাড়ি, খালিগা। পরনে ল্যাঙটের মত ময়লা একফালি ন্যাকড়া। বলিষ্ঠ, কালো দীর্ঘদেহ। একটা বানরের গায়ে সবুজ রংয়ের ফতোয়া, আর একটার গায়ে ফিকে গোলাপী রংয়ের বুকের কাছে ফুল তোলা ফ্রক আর ছোট বাচ্চাটার গায়ে কিছু ছিল না। লোকটা ঈশ্বর হয়ে বসেছে। বিনয় মনে মনে ভাবল। একটা পরিবারের ঈশ্বর। ফতুয়া পড়া বানরটা তার শেষ খেলা দেখাচ্ছিল। হাতে একটা লম্বা ছুরি। গলায় গিঁট দিয়ে বাঁধা দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত লোকটার বা হাতে ধরা একটা সরু লম্বা লাঠির মাথায় জড়ানো। বানরটা

লোকটাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে চাইছে। ডান হাতের লাঠি দিয়ে লোকটা বানরটাকে প্রতিহত করছে। বানরটা ছুরিটাকে উল্টাপাল্টা ধরছিল। একবার বাঁটটা উপরে তুলছে। ভোঁতা দিকটা সামনে আনছিল। দুহাতে লুফোলুফি করে ঠিক করছিল। আবার উল্টে লোকটাকে আঘাত করার সুযোগ খুঁজছিল ও। চারদিকে জমায়েত হওয়া লোকগুলো হাসছিল। বানরটা চোখদুটো পিটপিট করে লোকটার দিকে তাকাচ্ছে। তোমাকেও ধ্বংস করবে। তুমি ঈশ্বর, একটা পরিবারের ঈশ্বর। ও তোমাকে আঘাত করার সুযোগ খুঁজছে। ও তোমাকে আঘাত করবে। ··· ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে ধ্বংস করবে। বিনয় লোকটাকে ঈশ্বর ভাবছিল। লোকটা অর্ধ-উলঙ্গ। ঈশ্বরকে অর্ধ উলঙ্গ ভেবে বিনয় আত্মপ্রসাদ লাভ করল। বড় বানর দুটোর গায়ে ফতুয়া বা ফ্রক ছিল। পরনে কিছু ছিল না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল ওরা। আমরা সভ্য হয়েছি ঈশ্বর। আমরা গায়ে জামা রেখেছি। কিন্তু আমরা উলঙ্গ, ঈশ্বর তুমি আদিম। তুমি গায়ে জামা রাখো নি—কিন্তু অর্ধোলঙ্গ। ঈশ্বর, তোমাকে আমরা সভ্য করব। হাঃ হাঃ! ঈশ্বর তুমি সভ্য হবে। উলঙ্গ হবে। হাঃ হাঃ হাঃ! হাসিটা জোরে হয়ে গিয়েছিল। ওর চমক ভাঙল। চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ তাকায় নি। ওরা ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রামে নিজেদের হাস্যকর ভূমিকার নাট্যরূপ দেখছিল। বিকেলটা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। ময়দানের লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান। দ্রুত ছুটে যাওয়া ট্রাম বাসগুলোর ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছিল। কণ্ডাক্টারের পয়সা গুণতে, লোক দেখতে, টিকিট দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। ওরা আলো জ্বালিয়ে নিয়েছে। ওরা কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে চায় না। ওরা সৎ হতে চাইছে। শা—! বিনয় মাটিতে খানিকটা থুথু ছিটোল। আমাকে ভাড়া দিতে না হলে পয়সা বাঁচত। খিদেয় পেট কামড়াচ্ছে। আমি খেতে পারতাম। চীনে বাদাম অথবা শশার টুকরো খেয়ে জল খেতে পারতাম। কিন্তু—তাহলে আমাকে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিত। আমাকে হেঁটে শিয়ালদা যেতে হত।

একটা হাসির হররা উঠল চারিদিকে থেকে। বানরটা ছুরি সহ লাফাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। লোকটা লাঠি তুলছিল, বানরটা ভয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটা ডান হাতে ডুগডুগি বাজাচ্ছিল। বাঁ হাতে ধরা দড়ি বাঁধা লাঠিটা মাথার উপর দিয়ে ঘূর্ণায়মান। দড়িটা লাঠিতে জড়াচ্ছিল। গলায় টান লেগে বানরটা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছিল।

বাবু লোগোঁকো খেল্ দেখো। ছুরিকা খেল্ দেখো। ম্যাজিককা খেল্ দেখো।

একটা নির্দিষ্ট স্বরগ্রামে লোকটার কথাগুলো ফাটা রেকর্ডের মত একই বৃত্তে বার বার ঘুরছে। মাঝে মাঝে বানরটা লাফ দিয়ে লোকটার মাথায় পড়বার চেষ্টা করছিল। লোকটা চকিতে ডুগডুগি রেখে লাঠি নিচ্ছিল। চিৎকার দিয়ে উঠছিল. হেই। তারপর গালাগালির স্রোত—'শালা' শূয়র, হারামিকা বাচ্চা—।' চারদিকে লোকগুলো হো হো করে হাসছিল। এবং সামনের সারিতে বসা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো হাততালি দিচ্ছিল। লোকটা ডান হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে দমাদ্দম পেটাচ্ছিল। বানরটা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। আবার দড়িতে টান—আবার বানরটা ঘুরছে। কিঁউরে মুঝেকো মার ডালনা চাহতে হ্যায়—অ্যাঁ। বিনয় লোকটির চোখে বিদ্রূপের রেখা দেখছিল। সেই বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে মাঠময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে এই গোল হয়ে জমায়েত হওয়া লোকগুলোকে বিনয়ের অন্য জগতের বাসিন্দা বলে প্রতীতি হল।

যদিচ ঈশ্বরের আদিমতা এবং সভ্য হওয়ার হাস্যকর ধারণার বৃত্তে নিজেকে নিক্ষেপ করে বিনয় ক্রমে ক্রমে খুসী হয়ে উঠছিল, তথাপি লোকটার চোখের বিদ্রূপের রেখা, এবং তার দাঁতে দাঁত পেষা, ঠোঁটের কোণ বেঁকে যাওয়া ঈষৎ মাথা নাড়া—ইত্যাকার বিষয়গুলো বিনয়কে অন্যমনা করল। অথবা ঈশ্বর তুমি সভ্য হয়েই গেছ। তুমি অর্ধোলঙ্গ থেকে আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার চোখের দৃষ্টি, মুখের ভঙ্গি তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বর তুমি সভ্য হয়ে গেছ। এবং ঈশ্বরকে সভ্য ভাবতে পেরে বিনয় আরও বড় এক খুসীর জোয়ারে ভেসে গেল। এবং ঈশ্বর, সভ্য, সভ্যতা—এবম্বিধ শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুধাবন করতে করতে বিনয় সেই মুহূর্তে নিজেকে এক উঁচু দরের চিন্তানায়ক বলে সিদ্ধান্ত করে বসল। আর বিনয় খুসী হল।

হাততালির চটপট শব্দ শোনা গেল। শব্দ। শব্দ। জলের তলা থেকে উপরে উঠে আসা বুদ্বুদের মত শব্দগুলো বিনয়ের সামনে এসে ফেটে ফেটে পড়তে লাগল। এবং ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের নিকটবর্তী হতে থাকা এক আগন্তুকের মত শব্দ, শব্দের তরঙ্গে বিনয় স্থিতি লাভ করল। ...— ওরা হাসছে, চেঁচাচ্ছে গল্প করছে, গান গাইছে। ......ওরা চলে যাচ্ছে।

জায়গাটা ফাঁকা হয়ে আসছে।

বাহারে বাহা——

যা শালা, খেল তো খতম হো গিয়া।

যেন লোকটি ভাবছিল না, ভাবতে পারছিল না খেলাটা শেষ হয়ে গেছে। লোকটি কি চাইছিল খেলাটা আরো চলুক ; অতঃপর বানরটি তার মালিককে আঘাত করুক। আমিও তাই চাইছি। লোকটি কি তা জানে। আমি কি বলব? ওহে, শোন, শোন······। না—তা হয় না। বিনয় তার স্বাতন্ত্র্য বোধের জন্য এক পীড়া অনুভব করল।

মেহেরবাণী করকে কুছ দিজিয়ে বাবু।

বিনয় লোকটিকে তার চোখের সামনে দেখল। সেই ঈশ্বর প্রতিম লোকটি। ······লোকটি কি আমার বুক দেখতে পাচ্ছে? বুক? আমার চোখ? এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমার বুক দেখা যাচ্ছে না। আমার বুক ঢেকে রেখেছি। ও কি হাসছে? আমি কি ভয় পেয়েছি? ভয়? ভয়? ভয়? যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি—ওরা আমাকে করুণা করছে। ···. বিনয় সেই লোকটির চোখের তলায় দাঁড়িয়ে গলতে আরম্ভ করল। ওর শরীরের কয়েক তাল মাংস গলে গলে পরতে থাকল। ওর তরল রক্ত ধারা—সরু আঁকা বাঁকা ধোঁয়ার রেখার ন্যায় বাতাসের মধ্যে পাক খেতে খেতে মিশে যেতে থাকল। ——তারপর, সমস্ত মাংস, সমস্ত রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবার পর বিনয় পরিত্যক্ত সাদা কঙ্কালটা সেই ঈশ্বর প্রতিম লোকটির চোখের দিকে চেয়ে বড় ম্লান বীভৎস হাসি হাসল।

ময়দানের সীমা পেরিয়ে রাস্তায় পরতে এতক্ষণের চাপা দে'য়া ক্ষুধাটা চাগিয়ে উঠল। আমার কিছু খাওয়া দরকার—অর্থাৎ ছিল, একথা ভাবতে ফ্লাশব্যাকের মত সমস্ত কিছু আবার নূতন করে আবর্তিত হয়ে গেল। বাড়ী রাস্তা······নো ভেকেন্সিপ লিপি উৎকর্ণ সারি সারি, সারবন্দী মুখ, কাশী বিশ্বনাথ, জলের ঘটি এবং অতঃপর বিকেলের ময়দান, বানর তিনটি, বানর-ওয়ালা, ঈশ্বর প্রতিম লোকটি। বিনয় লোকটিকে আবার দেখল—আবার, শয়তান নির্লজ্জ—বিনয় চোখ বুঝল—ঈষৎ লাল, হলুদ আলোর ফুটকি। লোকটি হাসছে—কালো মুখে সাদা দাঁতের ঔজ্জ্বল্য—বিনয় দৌড়ুচ্ছে দৌড়ুচ্ছে না ঘুরছে। লোকটি সরু লম্বা লাঠি তুলল। বিনয় কাঁচুমাচুমুখে

দণ্ডায়মান, আমাকে যেতে দাও হে ঈশ্বর আমাকে পার হতে দাও……ঈশ্বর ঈশ্বর দাও হে ..। বিনয়ের ঠোঁট জোড়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে ঈষৎ কম্পমান অবনত দেহের অস্তিত্ব বুঝিবা বিলীয়মান। আমি তোমাকে শয়তান বলেছি, অথচ ত্থাখো; ত্থাখো হে আমি প্রার্থনাও করছি। আমার এখন রাস্তাটা পার হওয়া দরকার। কেন না আমি ক্ষুধায় কাতর। বিনয় চোখ বুজে রাস্তাটা পার হতে চাইল। দৌড়ুল। তারপর একটা তীব্র যান্ত্রিক আর্তনাদ শোনা গেল। বিনয় হতবুদ্ধি। কিয়ৎ পরিমাণে ভয়ত্রস্তও বা।

শালা উল্লুক কাহাকা।

বিনয় থমকাল, কিন্তু পেছোল না। থর থর কাঁপতে থাকা গাড়ীটাকে আস্তে আস্তে অতিক্রম করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে রাস্তা পার হল।

হরেক রকম আলোয়; মিলে নীল কুয়াশার মত একটা আলোর আস্তরণ জায়গাটা ঢেকে রেখেছে। আকাশবাণী ভবনের শীর্ষে লাল আলোটা আকাশের গায়ে লেপটে থাকা স্থির গ্রহের মত জ্বলছিল। বিনয়ের মাথা ঝিমঝিম, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছিল। ইচ্ছে করেছিল সে মুহূর্তে শুয়ে পড়তে। এবং তারপর চেতনা লুপ্তির অপার সুখ—একথা ভাবতে দেহ রোমাঞ্চিত। অথচ চেতনা লুপ্তির সম্ভাবনা ওকে ভীতও করছিল। আমার এখন থামা উচিত নয়, কেন না আমার বাড়ী যেতে হবে এবং… ..। একটা ট্রাম এসে ষ্টপেজে থামল—লোক উঠছে, নামছে। বিনয় শেডের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। শরীর কাঁপছিল, খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। তারপর আর বসেও থাকতে পারল না। শরীরটা একপাশে গড়িয়ে যেতে থাকল। মনে হচ্ছিল, যেন সে নীচে নেমে যাচ্ছে, নামছে, নামছে……। কারা যেন ওর দিকে আঙুল তুলে কথা বলছে, শুধু ঠোঁট নাড়া, শব্দ হচ্ছে না। ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা গাঢ়তর এবং বিনয় দেখল সমস্ত কোলকাতাও ওর সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। এবং তারপর জল, জল, জলের মধ্য দিয়ে পাথর-বাঁধা বেড়াল-ছানার মত বিনয়—আস্তে আস্তে পাতালের দিকে চলে যাচ্ছে। (উত্তরণ-১৯৭৩)